শুধু তোমার জন্যে
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

# [illegible] অথর্ব বন্ধের

# গল্প ভালো আবার বলো

অন্নপূর্ণা দেবী

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য নির্দ্ধারিত

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জ্যৈষ্ঠ—
১৩৭৫
৪

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
[illegible] টাকা

## ● বাছাই করা গল্পের সঙ্কলন ●

| | |
|---|---|
| ঝড় জল বৃষ্টি | ৪·০০ |
| পথ চলে গল্প বলে | ৪·০০ |
| বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প | ৪·০০ |
| হাসির টেক্কা | ৪·০০ |
| ফুলের ডালি | ৩·০০ |
| বাঘ ভালুকের দেশে | ৩·০০ |
| ছেলেবেলার গল্প | ৩·০০ |
| গল্প আমার অল্প নয় | ৩·০০ |
| হিপ্ হিপ্ হুররে | ৩·০০ |
| বহুরূপী | ৩·০০ |
| কত গান তো হোলো গাওয়া | ৩·০০ |
| শরতের শিউলি | ৩·০০ |
| সোনার ভারত | ৩·০০ |
| কিশোর মেলা | ৩·০০ |
| গল্প বলে দাদুমণি | ৩·০০ |
| দাদুমণির ঝুলি | ৩·০০ |
| শ্রীদুর্গার পলায়ন | ৩·০০ |
| ঠাকুরমার ঝুলি | ৩·০০ |
| ঠানদিদির থলে | ৩·০০ |
| পুরনো দিনের পুরনো গল্প | ৩·০০ |
| জলতরঙ্গ | ৩·০০ |
| ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা | ৩·০০ |
| রাক্ষস-খোক্কস | ৩·০০ |
| জন্মদিনের উপহার | ৩·০০ |
| যত হাসি ততই মজা | ৩·০০ |
| হাসির এ্যাটম বোম | ৩·০০ |
| শোনো শোনো গল্প শোনো | ৩·০০ |
| গল্প ভালো আবার বলো | ৩·০০ |
| গল্পের আলপনা | ৩·০০ |
| অনেক দিনের অনেক কথা | ৩·০০ |
| বরণ ডালা | ৩·০০ |
| পূজার দিনের উপহার | ৩·০০ |
| আলো দিয়ে গেল যারা | ৩·০০ |
| গল্পের মায়াপুরী | ২·৫০ |
| সাদা কালো | ৪·০০ |
| গল্পের চেয়ে অদ্ভুত | ৪·০০ |
| ছায়াপথ | ৪·০০ |

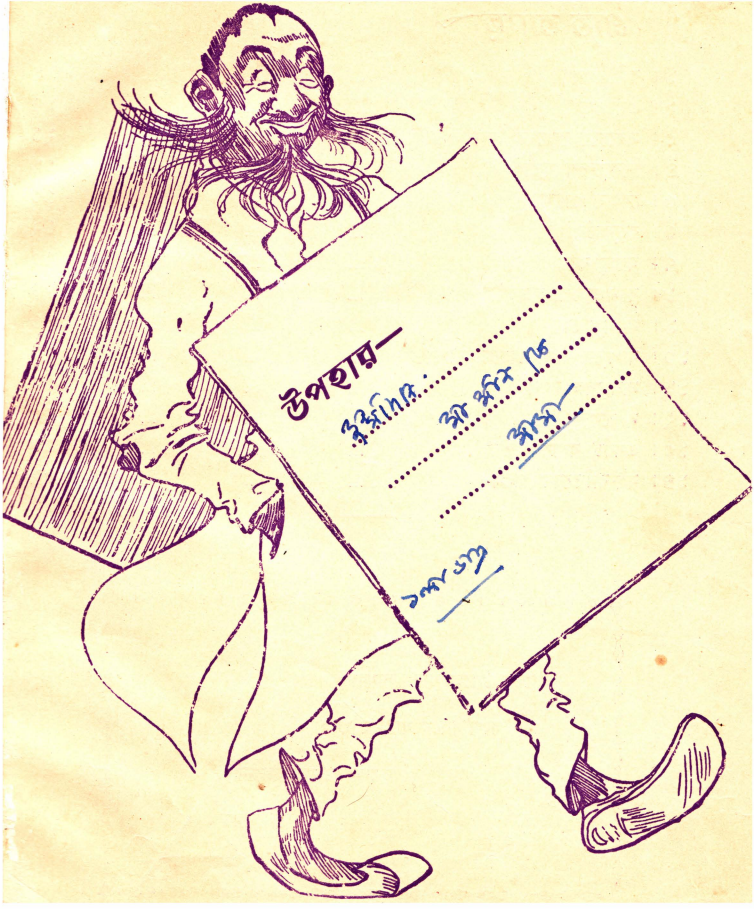
উপহার—
কৃষ্ণদাস
শ্রী শ্রীশ চন্দ্র
আশা
১লা মাঘ

## এতে আছে


| | | |
|---|---|---|
| ১। | কী বিপদ! | ১ |
| ২। | এক চড় | ১৭ |
| ৩। | সবচেয়ে দুঃখের দিন | ২৬ |
| ৪। | নিরুদ্দেশ যাত্রা | ৩৯ |
| ৫। | কেমন ওষুধ! | ৫৩ |
| ৬। | কচুকাটা | ৬২ |
| ৭। | ঘ্যাচ্ করে | ৭০ |
| ৮। | বচন হাটার লক্ষ্মীলাভ | ৮০ |
| ৯। | মানিক চাঁদ | ১০৫ |
| ১০। | বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ! | ১২১ |
| ১১। | মানুষের গল্প | ১৩০ |
| ১২। | মণিকোঠা | ১৪৩ |
| ১৩। | একটি বন্যবর্বরতা | ১৫২ |
| ১৪। | বই-বাতিকের গল্প | ১৬২ |


---

গল্প পেলে যারা লাফায়

গল্প বিনে যারা হাঁফায়,

গল্প বলি ফের তাদের জন্যে।

লেখিকা

# পরিচয়

**গল্প ভালো আবার বলো**

## গল্প বলো

সন্ধ্যেবেলা ছোট্ট খোকা বায়না ধরে তার মায়ের কাছে.....মা, এবার গল্প বলো...

গল্পের কথা শুনে অমনি আনন্দে ভরে ওঠে মায়ের মন। ছোট্ট খোকাকে আরো...আরো কাছে টেনে নিয়ে সুরু করেন গল্প...রূপ-কথার গল্প...হাসির গল্প...রাজারানীর গল্প—

ছোট্ট খোকা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে তার মায়ের মুখের দিকে...গল্প শুনতে শুনতে তার মন চলে যায় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে—

এই গল্পের ভেতর দিয়ে তার পরিচয় হয় মানুষের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে। সে জানতে পারে দৈত্যের কথা, জানতে পারে পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা, সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের দ্বীপের কথা।

ভোলে না সে কিছুই। দিনে দিনে খোকা বড় হয়। কিন্তু তার গল্প শোনবার আগ্রহ কমে না...বরং বেড়েই চলে। তখন সে খুঁজে বেড়ায় মনের মতন গল্পের বই। আর সেই বই-ই হয় তার জীবন-সাথী। খোকার বৈজ্ঞানিক মন জন্ম দেয় আধুনিক যুগের উড়োজাহাজের। শিশু বয়সের বিষ-মাখানো হাতের তীর যৌবনে আগ্নেয় অস্ত্ররূপে দেখা দেয়।

কেউ বা আবার মায়ের আসন পূর্ণ ক'রে বসেন গল্প লিখতে। আগামী দিনের খোকা-খুকুর জন্য সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অমর

সাহিত্যের। নতুন খোকা-খুকুরা তা পড়ে আনন্দ পায়। এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা ভাষার অমূল্য গ্রন্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র। আজও শিশুরা মুখস্থ করে—"মনে কর বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি অনেক দূরে।"

এর থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি—গল্প বলার কাজ খুব সোজা মনে হলেও আসলে সেটি মোটেই সোজা নয়। কারণ এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে শিশুর মনের খোরাক।

আশাপূর্ণা দেবী আজকের বাংলা সাহিত্যে একজন সেরা গল্প-বলিয়ে। তাঁর সাহিত্যে মুগ্ধ হয়েছে বাঙালী পাঠক-পাঠিকা। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও হাসির আবেগে ফেটে পড়ে আনন্দ পেয়েছে তারা। ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা ভুলতে পেরেছে তাদের জীবনের সব দুঃখ।

শিশুদেরও আনন্দ দিতে ভোলেননি তিনি। মায়ের মত সস্নেহে তাদের গল্প শুনিয়ে এসেছেন বহুদিন ধরে। আজ শিশুদের জন্যে তাঁরই লেখা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প আমরা তুলে দিলাম তোমাদের হাতে। আশা করি আমরা শুনতে পাব তোমরা বলছ—"গল্প ভালো আবার বলো"।

---

আমরাই 'হাঁ হাঁ' করে থামালাম !

# কী বিপদ!

সেই আমাদের বিখ্যাত রাজুমামা!

যাঁর গল্প লিখে লিখে ফুরোনো যায় না। সত্যি কত গল্পই তো লেখা হ'লো রাজুমামাকে নিয়ে, কিন্তু কতটুকুই বা হ'লো? কতটুকুই বা হ'তে পারবে? তা—সেই রাজুমামা অকস্মাৎ আজ ভোরবেলা এসে হাজির!

কোথা থেকে?

তা' কে জানে?

হঠাৎ কিছুদিনের জন্যে যে একেবারে হাপিস্ হয়ে গিয়েছিলেন রাজুমামা! না খবর না পাত্তা। প্রথম প্রথম—মানে আর কি যখন—জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাপিস্ হয়ে যাওয়াটা ঠিক বরদাস্ত করে নেওয়া যাচ্ছিল না, তখন—কেউ কেউ বলেছিল, "মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে চিংলিপুট না চিদাম্বরম কোথায় যেন চলে গেছে রাজু, বলে গেছে আমাদের।" কেউ কেউ বললো, "রাজুকে তো ভূতে পায়নি যে ওদের বলে কয়ে তবে যাবে! রাজু করবে চাকরী! হুঁ! রাজু গেছে আসামের

# গল্প ভালো আবার বলো

জঙ্গল এলাকায় হাতীর দাঁত চালানের ব্যবসা ফাঁদতে।" ...আরো কতক জন বললো, "আরে বাবা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি রাজু বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করছে সরকারি মিউজিয়ামের জন্যে।" বাকী কিছুজন এ'দের সকলকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, "ওসব কিস্যু না, হঠাৎ এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে বীরভূমের ওদিকে চলে গিয়েছে রাজু স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে। চেনালোক দেখলে আর চিনতে পারে না—"

কিন্তু ওই গুজবের জমজমাটিই। কেউ খুঁজে পেতে দেখতে যায়নি রাজু-মামাকে। মা বাপ তো নেই লোকটার যে, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন "রাজু যেখানেই থাক চলিয়া আইস, তোমার অভাবে আমরা মৃত্যুশয্যায়, টাকার দরকার হইলে জানাও।"

কাজে কাজেই রাজুমামা সম্বন্ধে ওই গুজবগাজবই চলতে লাগলো, আর ঠিক যখন সবাই ওসব আলোচনা থামিয়ে ফেলেছে, আর রাজুমামাকে 'ভুলবো' 'ভুলবো' করছে, সেই সময় রাজুমামার একেবারে সশরীরে আবির্ভাব। এই আমাদেরই বাড়ীতে, ভোরবেলা আমরা যখন কেউ কেউ ঘুম থেকে উঠেছি, কেউ কেউ উঠিনি।

আমার ঘুম ভেঙেছিল মার ডুকরে ওঠা কান্নায়।

উঠে দেখি মা নাক মুছছেন আর বলছেন "রাজু তা'হলে এলি ভাই! আমরা ভেবে বসেছিলাম—" কি ভেবেছিলেন সেই অপয়া কথাটা আর উচ্চারণ করেন না মা, রাজুমামা আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "এই দেখ টাবু, তোর মার কাণ্ড! তুই যা তো শীগগির গিয়ে ট্যাক্সী ভাড়াটা মিটিয়ে দিগে তো! মহাবিপদে পড়েছি—আমার কাছে আবার বড় নোট ছাড়া কিছু নেই—"

পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে, সেটা বার দুই সকলের নাকের সামনে নাচিয়ে ফের পকেটে পুরলেন রাজুমামা।

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

অগত্যাই আমি ছুটে বাবার ঘরে ঢুকে বাবার পকেট থেকে কিছু ছোট্ট নোট বার করে নিয়ে রাস্তায় দৌড়লাম ট্যাক্সীর মিটার মিটোতে।

এসে দেখি!

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে রাজুমামার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে রাজুমামার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন আর বলছেন, "কোথায় চলে গিয়েছিলিরে রাজু, কোথায় ছিলি এতদিন?"

রাজুমামা আমাদের সকলের দিকে একবার কৃপাদৃষ্টি বুলিয়ে একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলেন, "ছিলাম অজ্ঞাতবাসে।"

অজ্ঞাতবাসে!

হঠাৎ যেন মহাভারতের একখানা পাতা খসে এসে পড়লো! মহাভারতে ছাড়া 'অজ্ঞাতবাস' আর কে কবে করেছে? মা

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

বললেন, "কেন বাপু, তোর এই দুর্ম্মতি? কী দরকার?"

রাজুমামা আরো বিচিত্র একটু হাসি হেসে বললেন, "দরকার আছে বৈকি টেঁপিদি, সকলের জীবনেই মাঝে মাঝে অজ্ঞাতবাসের দরকার আছে। সবাই করে না এই যা।"

আমি ফস্ করে বলি, "কি জন্যে মামা?"

"কি জন্যে?" রাজুমামার মুখে একটা দেবভাব ফুটে ওঠে "আত্মশুদ্ধির জন্যে।"

"আত্মশুদ্ধি!"

"তবে না তো কি? জীবনে কতো অকর্ম্ম অপকর্ম্ম করছি আমরা, আত্মাকে কত অশুদ্ধ করছি, মাঝে মাঝে শুদ্ধির দরকার নেই?"

এবার হাঁ হয়ে যাই।

বাসি কাপড় পরে কাচা কাপড় ছুঁয়ে ফেললে সে কাপড় অশুদ্ধ হয়ে যায় জানি, মানে মা জানিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু আত্মা! সে ও? অথচ সেবারে তো এই রাজু-মামাই, যখন গীতা না কি পড়তেন, তখন একদিন আমাদের সাট্টে পাট্টে ধরে বুঝিয়ে-ছিলেন 'আত্মা' না কি এমন একটা ধাতু যে আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, ছিঁড়লে ছেঁড়ে না, কাটলে কাটে না, এক কথায় হামানদিস্তেয় ফেলে কুটলেও আত্মা না কি যেমনকে তেমন। সেই জিনিসে ছোঁয়ার দোষ লাগে! কি জানি বাবা! রাজুমামা কতো কিই যে জানেন!

একটু পরেই মা যখন সুস্থ হয়ে বসেছেন, রাজুমামা বলে উঠলেন, "হ্যাঁরে টাবু, তোদের ওই চাকরটা নতুন না পুরনো?"

মা চমকে উঠে বললেন, "কেন বল্‌তো? একেবারে আনকোরা নতুন যে। চিনিস টিনিস না কি?"

# গল্প ভালো আবার বলো

রাজুমামা বললেন, "না না, তা নয়, ভাবছিলাম একশো টাকার নোটটা ওর হাতে ভাঙাতে ছেড়ে দেব?"

"কেন খামোকা ওর হাতে ভাঙাতে—"

"আহা ইয়ে বুঝছিস না, ছেলেদের জন্যে দু'টাকার মিষ্টি আনতে দেব!"

সংগে বড় নোট ছাড়া আর কিছু নেই—" [পৃঃ—৬

মার চোখ কপালে। "আরে বাবা আবার মিষ্টি কেন? তুই এসেছিস এই ঢের!"

রাজুমামা বলেন, "তা কি হয়, এতদিন পরে এলাম—"

পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা বার করে নিয়ে আঙুলের টোকা দিতে থাকেন রাজুমামা আর দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করতে থাকেন। মাও নেবেন না, রাজুমামাও ছাড়বেন না। আমি একবার বলেছিলাম 'আমিই না হয় ভাঙিয়ে—' ইয়ে—

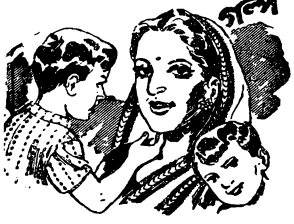

# গল্প ভালো আবার বলো

মিষ্টির ব্যাপারটা যে এই কথা-কাটাকাটির হুল্লোড়ে ফসকে যায় এটা আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মা বকে উঠলেন। চিরদিনই দেখেছি মা কোনদিনই আমাদের অনুকূলে নয়। মা বললেন, "রাজুর যেমন কথা, একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে মিষ্টি! তুইও তাই শুনছিস! খাবারের দোকানীই দেবে না কি ভাঙিয়ে এই 'বৌনি' বেলায়?"

রাজুমামার মুখটা ভারী দুঃখিত দুঃখিত লাগে। শুকনো মুখে বলেন, "কী বিপদেই যে পড়েছি! সঙ্গে বড় নোট ছাড়া আর কিছু নেই—"

মার বোধকরি একটু মায়া হ'লো, জানিনা—রাজুমামার মুখ দেখে কি আমাদের মুখ দেখে। শেষ অবধি বললেন, "বেশ বাবু আমি আনাচ্ছি মিষ্টি, টাকা তুই পরে দিস।"

রাজুমামা নিরুপায় মুখে নোটখানা পকেটে পুরলেন। বললেন, "না নিলে কিন্তু রক্ষে রাখবো না—"

আবার বাবার পকেটে হাত ঢোকাতে হ'লো আমায়!

চিরদিনই দেখেছি—শুধু মা নয়, মা আর ভগবান এই দুই লোক বরাবর আমাদের বিপক্ষে! যা আমাদের পছন্দ তা'তেই তাঁদের অপছন্দ। কিন্তু আজ দেখছি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত, ভগবানের ভারী দয়া!

কি করে বুঝলাম!

কারণ আজ হচ্ছে রবিবার!

অর্থাৎ আজ ভাগ্যে সমস্তটি দিন রাজুমামার সঙ্গ-সুখ!

এ কী সোজা মজা?

কত গল্প যে জানেন রাজুমামা! আর কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত আর অসম্ভব অসম্ভব ঘটনা রাজুমামার নিজের জীবনেই ঘটেছে! শুনে শুনে তাক্ লেগে যায়!

এই যে—এবারের আত্মশুদ্ধির অজ্ঞাতবাসের ক'মাস! কে বলতে পারে এর

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

মধ্যে কী মহাভারতই না ঘটে গেছে রাজুমামার জীবনে। হয়তো ইত্যবসরে সবই করেছেন রাজুমামা! চিংলিপুটের চাকরী, হাতীর দাঁতের ব্যবসা, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, ইস্তক কাপালিকের কবলে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখেননি!

রাজুমামা যদি লেখক হতেন, নির্ঘাৎ শুধু আত্মজীবনী লিখেই বাড়ী গাড়ী করে ফেলতে পারতেন! কাজেই রাজুমামার সঙ্গে একটি রবিবারের দুপুর মানে একটি মোটাসোটা পুজোবার্ষিকী!

আবার বাবার পকেটে হাত ঢোকাতে হ'লো আমায়

একে রবিবার তায় রাজুমামা এসেছেন, রান্নাবান্না যা হ'লো প্রচুর! খেয়ে উঠতেই বেলা দুটো! তবু আমরা খেয়ে উঠেই ছেঁকে ধরেছি "রাজু-মামা গল্প! রাজুমামা গল্প!"

রাজুমামা একবার আমাদের সকলের দিকে স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, "গল্প? সে তো হবেই। তবে আমি ভাবছিলাম অন্য কথা! গল্প তো রাত্তিরেও হ'তে পারে!"

[ পৃঃ—৬

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

"কি অন্য কথা! ও রাজুমামা অন্য কথা আবার কেন?"

রাজুমামা হাস্যবদনে বললেন, "মানে আর কি এতদিন পরে এলাম তোদের কাছে, ভাবছিলাম তোদের সবকটাকে আজ ছুটির দিনে সিনেমা দেখিয়ে দিই। মামা হই—দেখতে ভালবাসিস তোরা—"

আমরা নিঃস্পন্দ নিস্তব্ধ!

না, শুধু আনন্দেই নয়, আত্মশুদ্ধির অলৌকিক ক্ষমতা দেখে! সেই রাজুমামা! যিনি এ-যাবৎকাল শুধু সিনেমা দেখার অপকারিতা নিয়েই বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন!

আমাদের স্তব্ধতা দেখে রাজুমামা বোধ হয় উল্টো বুঝলেন, বললেন, "দেখ ভেবে! আমি বলছিলাম—গল্প তো রাত্রেও হতে পারে! তবে তোরা যদি সিনেমা পছন্দ না করিস আলাদা কথা।"

পছন্দ করবো না! সিনেমা! আমাদের নীরবতা ফটাস্ করে ফেটে গেল ফুলে বেলুনের মত! চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা "পছন্দ করব পছন্দ করব, সেই ভালো—সেই ভালো! এখন সিনেমা, রাত্তিরে গল্প।"

সময় আর বেশী ছিল না, দু'পুরের শো কিনা! হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, আর পথে বেরিয়েই রাজুমামা হায় হায় করে উঠলেন, "এই দেখো আবার সেই বিপদের সামনে পড়ে যাচ্ছি! ওরে বাবা টাবু, মানিক আমার এখনকার মত এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবি?"

হকচকিয়ে গিয়েছি, রাজুমামার আগের বিপদের কথা মনে ছিল না। হঠাৎ সেই পুরনো বিপদ আবার নতুন হয়ে ঝলসে উঠলো রাজুমামার পকেট থেকে হাতে।

সেই বড় নোট!

"ছবি আরম্ভ হয়ে যাবার সময় তো আসন্ন টাবু, একশো টাকার নোটের চেঞ্জ গুণে ফেরত নিতে নিতে তো অর্দ্ধেক হয়ে যাবে! কী উপায়?"

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

"মার কাছ থেকে আনবো?"
ইতস্ততঃ করে বলি।
"তাই আনবি! তোদের কাছে কিছু নেই?"
আমাদের কাছে!

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। যা আছে সে এতোই অকিঞ্চিৎ, উচ্চারণ করা যাবে না।

"তবে তাই যা বাবা—" হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা ফ্লো এসে যায় রাজুমামার কথায় "ছুটে যা! যাবি আর আসবি। গোটা বারো তেরো হলেই হবে। মার বাক্স, বাবার পকেট, যেখান থেকে পাস নিয়ে দৌড়ে আয় জল্‌দি। ফিরে এসে তখন বলিস। মানে ততোক্ষণে তো নোটটা ভাঙানো হবেই—একেবারে শোধ দিয়ে—ছুটে যা ছুটে যা।"

সদলবলে সিনেমার পথে যাত্রা করেন রাজুমামা।

রাজুমামা হাস্যবদনে বললেন [ পৃঃ—৮

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

সঙ্গে বেলু নীপু ঘটাই দুগ্‌গা বুলা আমি হারু। ছবি সুরু হতেই সুরু হয় রাজুমামার উপদেশ,

'ওই যে 'লাইফবয়' সাবানের ছবিটা দেখালো, ওটা স্রেফ বিজ্ঞাপন বুঝলি? মেখে দেখেছি আমি ও সাবান, অতো কিছু নয়—"

আমরা ফিসফিস করে বলি, "বিজ্ঞাপন, সে তো সকলেই জানে রাজুমামা!"

রাজুমামা এ কথায় কর্ণপাত করেন না, বলে চলেন, "আর ওই যে 'দালদা'র কথা বললো, স্রেফ গাঁজাখুরি। এই সব দেখিয়ে নগদ পাঁচসিকে করে পয়সা নিচ্ছে, দেখ তো কাণ্ড!"

অবাক হয়ে বলি, "আসল ছবি তো এখনো আরম্ভই হয়নি মামা—"

রাজুমামা গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, "সে হ'লো আর না হ'লো! হলেও ওই 'লাইফবয়' 'টিনোপল' আর 'দালদা'র ছবিরই কাছাকাছি—"

আরো কিছু বলতেন রাজুমামা, অন্ধকারে ওঁর মুখ চোখের ভাব না দেখতে পেলেও বেশ বুঝছিলাম ওঁর বক্তৃতা চেগেছে। কিন্তু রক্ষে দিলেন পিছনের ভদ্রলোক। রাজুমামার বদলে আমার মাথার চাঁদিতে একটা টোকা দিয়ে বলে উঠলেন, "ওহে বাপু, এটা গল্প করবার জায়গা নয়। ওটা বাড়ী ফিরে কোরো।"

শুনেই গুম্ হয়ে গেলেন মামা!

আসল ছবি সুরু হ'লো, হাঁ করে দেখছি, রাজুমামাও নীরব। দুম্ করে ইনটারভ্যাল!

দেখি হাতছানি দিয়ে একটা পটেটোচীপস্‌ওলাকে ডাকলেন রাজুমামা, আর সে আসতেই তার নাকের সামনে তুলে ধরলেন সেই বহুবার দৃষ্ট একশো টাকার নোটখানি।

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

"ভাঙানি হবে?"

সে ছোঁড়া ফ্যালফ্যাল করে একবার বোধকরি তার জীবনের এই প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো!

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল এক মাথা ঝাঁকুনি দিলেন রাজুমামা. "কী বিপদেই পড়লাম রে বাবা! উঃ ইচ্ছে করছে নোটখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে একশো টুকরো করে নিই। সামান্য একখানা একশো টাকার নোট ভাঙানো যাচ্ছে না সেই সকাল থেকে! মরুক গে পটেটো-চীপ্‌স্‌ আর হ'লো না আজ।"

"ওহে বাপু, এটা গল্প করবার জায়গা নয় [পৃঃ—১০

বাড়ী ফিরেই খাওয়া দাওয়ার হৈ-হুল্লোড়. সঙ্গে সঙ্গে রাজুমামার সেই বিশ্ব নস্যাৎ করা গল্প!

"উট দেখলি টাবু. ছবিতে উট

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

দেখলি? দেখে হেসে মরি! স্রেফ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের উট। উট চলেছে গুটি গুটি। সত্যিকারের মরুভূমির উট, মোটর বাইকের মতো দৌড়য় বুঝলি? ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে কদমে কদমে! জীবনে দেখলাম তো অনেক কিছুই—"

তারপরই হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন "এই যাঃ দেশলাইটা বুঝি সিনেমার ঘরে ফেলে এলাম! টাবু যা তো বাবা, চট্ করে একটা দেশলাই কিনে আন তো—"

আমি প্রতিবাদ করে উঠি, "দেশলাই আবার কিনে আনবো কি? বাড়ীতে কতো—"

"আহা হোক না হোক না। অপরের জিনিস যতো কম নেওয়া যায় ততোই ভালো! তাছাড়া আমার তো এটা ভাঙাবারও দরকার রয়েছে—"

পকেট থেকে সেই ঐতিহাসিক নোটখানি টেনে বার করেন রাজুমামা!

"ছুট্টে যাবি! ভাঙানিটা অবিশ্যি গুণে নিস ভাল করে!"

আমি আমার সন্দেহ ব্যক্ত করি, "মাত্র একটা দেশলাই কিনলে বোধ হয় ভাঙিয়ে দেবে না মামা—"

"দেবে না? ওর ঘাড় দেবে! চলতো দেখি কেমন তোদের পাড়ার দোকানী—"

উঠে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়েন রাজুমামা। "থাকগে আমি রাগী মানুষ আবার তোদের পাড়ায় দাঙ্গা বাধাবো! ও কাল সকালে যা হয় হবে।"

কিন্তু পরদিন সকালে কিছু হ'লো না। বিকেলেও না! দেশলাই তো রান্না-ঘর থেকে এনেই ছিলাম। সিগারেট বাবার টিন থেকে, নস্যি আর কামাবার ব্লেড্ ছোটকাকার ঘর থেকে, কারণ রাজুমামা বলতে লাগলেন, "যে তোমাদের পাড়ার দোকান, হয়তো সামান্য একখানা নোটের ভাঙানিও দিতে পারবে না।"

# গল্প ভালো আবার বলো

তা' মিথ্যেও বলেন নি রাজুমামা আমাদের পাড়াটা হতভাগাই বটে। নইলে দুপুরে যখন রাজুমামা আমাদের বাড়ীশুদ্ধু সকলকে ম্যাগ্নোলিয়া খাওয়ালেন, আর বিকেলে ঘুগনি আলুর চপ্, তখনও তো সেই রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে হলো রাজুমামাকে একশো টাকার নোটখানা হাতে করে!

দেবে না? ওর ঘাড় দেবে! [পৃঃ—১২

নেহাৎ নাকি মাথার আধখানাই টাক রাজুমামার, তাই চুলের মুঠি হাতে উঠে এলো না। দুঃখে ক্ষোভে নোটখানাই ছিঁড়তে যাচ্ছিলেন, আমরাই 'হাঁ হাঁ' করে থামালাম!

শেষ পর্য্যন্ত হাত পা এলিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন রাজুমামা, ও সবের পয়সা আমরাই ধার দিলাম!

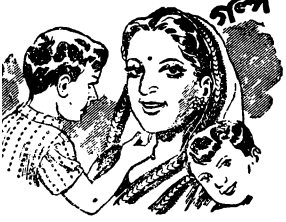

# গল্প ভালো আবার বলো

"সত্যি কী কষ্ট রাজুমামার!" ঘটাই বললো—"রোজ কতো নোট ভাঙানো হয় তো, কতো সহজেই ভাঙে, কিন্তু রাজুমামার নোটটা যেন বজ্জর! কিছুতে ভাঙতে চাইছে না!"

"আমার কপাল!"

বললেন রাজুমামা কপালের ঘাম মুছে! আবার লাফিয়ে উঠলেন রাজুমামা, বললেন, "এ কপালের লেখা মুছবোই! চল।"

"কোথায়?"

"যেখানে খুসি!"

বাড়ী থেকে বেরিয়েই লাফিয়ে একটা রিকশয় চড়ে বসলেন রাজুমামা, বললেন, "চল ট্রাম লাইন।"

আর ট্রাম লাইনে নেমেই দরাজ হাতে বার করে ফেললেন সেই নোটখানি, "দে ভাঙানি দে!"

লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমার।

আমাদের পাড়ার রিকশওলাগুলোও কি এমন দীনদুঃখী!

পারলো না! সামান্য একখানা নোট ভাঙিয়ে দিতে পারলো না!

সত্যি প্রাণে বড্ড লেগেছিলো রাজুমামার!

প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদেই উঠেছিলেন, "ওরে বাবারে, কী বিপদেই পড়লাম রে আমি!"

তাড়াতাড়ি করে আমিই চুপ করাই, নিজের পকেট থেকে তিন আনা পয়সা রিকশওলাকে দিয়ে!

তারপর?

তারপর—সে আমাদেরই লজ্জার কথা।

মানে আমাদের পাড়ার!

বাসে উঠে হাওড়া পর্য্যন্ত গেলেন রাজুমামা, তবু সেই বজ্জর নোট ভাঙাতে পারলেন না। আমাদের দু'জনের দশ পয়সা দশ পয়সা পাঁচআনা বাদ দিয়ে সামান্য নিরেনব্বই টাকা এগারো আনা পয়সা দিতে পারলো না, বাস কণ্ডাকটার!

ব্যস!

আর ফিরলেন না রাজুমামা! রাগে গন গন করতে করতে ষ্টেশনে ঢুকে একেবারে চড়ে বসলেন ট্রেনের একখানি কামরায়!

আমিও দৌড়চ্ছি পিছন পিছন!

"ও রাজুমামা, যাচ্ছো কোথায়?"

"চুলোয়, জাহান্নমে, যেখানে হোক! মোট কথা এখানে আর নয়।"

ব্যাকুল হয়ে উঠি, "কিন্তু টিকিট করলে কই?"

"টিকিট!" খিঁচিয়ে উঠলেন রাজুমামা, "করবো কোথা থেকে? সেখানেও হয়তো বলে বসবে নোটের ভাঙানি নেই! উঃ কী বিপদেই পড়েছি! এমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়! একশোটা টাকা হাতে নিয়ে, ভিখিরীর মতো হাত পেতে পেতে বেড়াচ্ছি! বলে দিস টেঁপিদিকে, চলে গেলাম আমি। আর কী যে মনোকষ্ট পেয়ে গেলাম তাও বলিস। তুই তো সাক্ষী আছিস সবেরই।"

গাড়ী নড়ে উঠলো।

আমি কাঁদো কাঁদো। সত্যি আমাদের কাছে এসে এতো মনোকষ্ট পেয়ে চলে যেতে হ'লো রাজুমামাকে! হঠাৎ সর্পাহতের মতো আর্ত্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলেন রাজুমামা, "ওরে টাবু, তোদের ধারগুলো যে শোধ হ'লো না! কতো হয়েছে বল্ দিকি। বল্ বল্ শীগ্‌গির বল্। কালকের ট্যাক্সীভাড়া, মিষ্টি, সিনেমা—কতো হ'লো বল্‌নারে—টাবু—"

● কী বিপদ!

# গল্প ভালো আবার বলো

কিন্তু আমার মাথার মধ্যেই তখন রেল চলছে, কিছুই বলতে পারি না।

রাজুমামা ধমকে ওঠেন, "চুপ করে আছিস যে? তোরা কি আমাকে ঋণী করে রাখতে চাস?"

গাড়ী চলতে সুরু করে। রাজুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন "দেশলাই—সিগারেট—নস্যি—ব্লেড্—" গাড়ী মোশান নিয়েছে, রাজুমামাও গলা চড়াচ্ছেন, "আই-ই-সক্রী-ম ঘুগনিই-ই—আ-আলু-উর চ-অ-প্ স-ব-দা-আ-ম পাঠি—য়ে দেএ—এ-বো ও-ও—ম-ও-ওনি অর্ডা—রে এ এ, বি-ই-ঈ-ঈল্ টা-আ—পা-ঠি-ই য়ে, এ-এ—দি—স্।"

প্রাণপণে দৌড়চ্ছি আমি রেলের সঙ্গে।

গলা ভেঙে চীৎকার করি, "কিন্তু রাজুমামা তোমার ঠিকানাটা?"

তার উত্তর আর শুনতে পাওয়া যায় না।

শুধু আরো কিছুক্ষণ মুখটা দেখা যায় রাজুমামার, কপালের ঘাম মুছছেন।

কি জানি, হয়তো রাজুমামা নিজেও জানেন না ঠিকানা কি!

হয়তো আবার অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছেন, আত্মশুদ্ধির জন্যে! মাঝে মাঝে তো করতেই হয় শুনেছি!

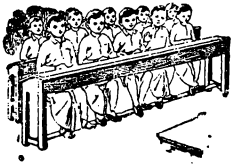

# একচড়

ডাবরের মতো মুখ, ঘটের মতো পেট, থোড়ের মতো হাত পা, বুরুশ-কুচির মতো চুল আর সবটা মিলিয়ে একটি আস্ত বিলিতি কুমড়োর মতো চেহারা!

নীল হাফ্‌প্যাণ্ট আর গোলাপী হাফ্‌সার্ট পরে এসে দাঁড়ালো! না, শুধু 'দাঁড়ালো' বললে ভুল হবে —এসেই বাড়ীসুদ্ধু সক্কলকে ঘটাঘট্‌ প্রণাম করতে সুরু করলো। যতো বলা হচ্ছে 'থাক্‌ থাক্‌', কে কার কথা শোনে। শেষ পর্য্যন্ত ভয়ানক একটা হাসির রোল ওঠায় তবে থামা দিলো। বোধ হয় এতোক্ষণে মাথায় ঢুকলো একটা কিছু ভুল করে ফেলেছে।

আমাদের এদিকে ছিপিখোলা সোডার বোতলের সোডার মতো হাসি বাগ মানছে না। হরিদাস আমাদের চাকর বনমালীকে সুদ্ধু প্রণাম করে মরেছে! এতে বাপু কে হাসি চেপে রাখতে পারে? বনমালী তো কাসতেই সুরু করে দিয়েছে।

অবিশ্যি মানলাম বনমালীকে চাকর বলে বোঝা মফস্বলের ছেলের কর্ম্ম নয়,

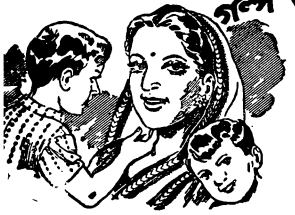

# গল্প ভালো আবার বলো

কারণ, বনমালী তার গেঞ্জি পর্য্যন্ত স্টীম লণ্ড্রীতে কাচিয়ে নেয়। তবু—আমরা তো হাসবোই!

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওর নামকরণ করে ফেললাম ভক্ত হরিদাস!

রাসু অমায়িক মুখে বলে, "হ্যাঁ ভাই ভক্ত হরিদাস, তোমাদের দেশে ঝাড়ুদার-টাড়ুদারদেরও প্রণাম করতে হয়?"

হরিদাস অবাক মুখে বলে, "ঝাড়ুদার? কই না তো!"

আমরা আর একবার সরবে হেসে উঠি।

এরপর মেজখুড়িমা ওকে জলখাবার-ছুতোয় উদ্ধার করে নিয়ে যান। কারণ, হরিদাস মেজখুড়িমারই দূর সম্পর্কের বোনপো। মেদিনীপুর জেলার কোন গ্রাম থেকে যেন স্কুল-ফাইন্যাল দিয়ে কলকাতায় কলেজে পড়বার আশায় এসেছে। এখানেই থাকবার বাসনা।

তবু—আমরা তো হাসবোই!

# গল্প ভালো আবার বলো

শুনে রাসু, নসু আর আমি 'হুর্‌রে' করে উঠলাম।

আহা, উঠতে বসতে হাতের কাছে ক্ষ্যাপানোর উপযুক্ত এমন একখানি চীজ্‌ অনেক পুণ্যফলে মেলে!

প্রথম আলাপ-আলোচনার ধরণটা এই—

"হ্যাঁ হে হরিদাস, তোমাদের স্কুলের নামটা কি?"

"মাকড়তলা হাই স্কুল!"

বলা বাহুল্য আগেই শুনেছি, তবু চোখ কপালে তুলে বলি, "ওঃ তাই!"

"তাই মানে?" হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত।

আমি উদাসীনের অবতার হয়ে বলি—"না, মানে স্কুলটা যখন মাকড়তলা, তখন তার ছাত্রদের একটু মাকড়া মাকড়া বুদ্ধি তো হবেই।"

আমাদের সঙ্গে বনমালীও হাসে—"হি হি হি, আমাদের হরিদাসবাবু না কি কলকেতার কলেজে পড়বে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলি, "দূর পাগলা, কলকাতার কলেজে পড়বে কি? ওকে পড়াবার উপযুক্ত প্রফেসর কি আর এদেশে আছে? ও সোজাসুজি বিলেতেই চলে যাবে!"

হরিদাস তার কুমড়োর মতো ভার ভারীক্কি চেহারাটি নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "বিলেত যাবার অবস্থা থাকলে তো যেতামই, বাবার সামান্য আয়, কি করে হবে বলো ভাই?"

আমরা আশা করছিলাম হরিদাস আমাদের 'আপনি' বলবে, 'তুমি' বলায় চটলাম। অথচ স্পষ্ট করে বলতেও পারি না, আমরা তিনজন, মানে রাসু নসু আর আমিও যে এবারে স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই বসে আছি। ও যদি আমাদের আপনি

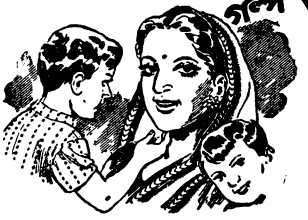

# গল্প ভালো আবার বলো

আজ্ঞে করে, খামোকা বয়েস বেড়ে যায় আমাদের। অথচ ওই হাফ্‌প্যাণ্ট পরা গাঁইয়া ছেলেটা আমাদের তুমি তুমি করবে এও অসহ্য।

বললাম, "হরিদাস তোমার বয়েস কতো?"

হরিদাস বুরুশ-কুচির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, "চোদ্দ!"

শোনো, শোনো কথা একবার! ওইতো ভূত একটা, কোন না এক এক ক্লাসে দু'বছর করে জিরিয়েছেন, উনি না কি আবার চোদ্দ বছরে স্কুল ফাইন্যাল সেরে এসেছেন। তা' ছাড়া ওজনে তো আমাদের দু'জনের একজন। বোকা চালিয়াৎ আর কাকে বলে।

মুখ বাঁকিয়ে হাসি আমরা, আর বলি, "সে কি হরিদাস, চোদ্দ? অতো বয়েস তোমার? আমরা ভাবছিলাম দশ এগারো!"

হরিদাস তার ইঁটের মতো নীরেট মুখে গরুর মতো চোখ দুটি ড্যাব্‌ডেবিয়ে বলে, "সে কি ভাই, অতো কম কি করে হবে? দশটা ক্লাস পার হতেই তো দশ বছর লেগে গেছে।"

রাসু বলে, "তাই বুঝি? আহা! আমরা ভাবছিলাম তোমার মতো এমন একটা ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্টের কি আর ক্লাস টেনে উঠতে দশ বছর লেগেছে? ডবল প্রমোশন পেয়ে পেয়ে বোধ হয় পাঁচ বছরেই সেরেছো।"

হাঁদারাম আরো নীরেট মুখে বলে, "হতো হয়তো, কিন্তু আমাদের স্কুলটায় যে আবার ডবল প্রমোশনের নিয়ম নেই!"

আচ্ছা এতো 'গাড্ডু' মানুষে হয়?

এ ছেলে যে স্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত এগিয়েছে কি করে, তাই ভাববার কথা। রাসু বলে, "ভাববার কিছু নেই, মনে রেখো 'মাকড়তলা'।"

মেজদা আবার ওর আর একটি নতুন নামকরণ করেন। বেশ চমকপ্রদ

আবিষ্কার। গম্ভীরভাবে ডাকলেন, "ভূষিমাল, ওহে ভূষিমাল, শোনো শোনো।"

হরিদাস হকচকিয়ে বলে, "আমায় কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ হে বাপু।"

"কিন্তু আমার নাম—মানে আমার নাম হরিদাস।"

"তাতে কি?" মেজদা মুচকে হাসেন, "অতো শক্ত কথা বাপু আমার মনে থাকে না, তার চাইতে 'ভূষিমাল' অনেক সোজা। আপত্তি আছে তোমার?"

রেজাল্ট তো বেরিয়ে এলো

হরিদাস গম্ভীর মুখে বলে, "আজ্ঞে না, আপত্তি কিসের? নামেতে কি আসে যায়? ভূষিমাল বলে যদি আপনি সুখ পান তাই বলবেন।"

মেজদাও গম্ভীর হয়ে বলেন, "রেজাল্ট তো বেরিয়ে এলো, কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হবে ঠিক করেছো?"

ভূষিমাল লজ্জাবতী কনে বৌয়ের মতো ঘাড় হেঁট করে বলে, "আজ্ঞে ওর আর ঠিক করা করি কি? প্রেসিডেন্সিই তো শুনেছি সব থেকে সেরা কলেজ, ওতেই যাবে।"

# গল্প ভালো আবার বলো

মেজদা তীক্ষ্ম হাসি হেসে বলেন, "তা' হলে তো বাপু ভূষিমাল ডাকটা ঠিক হয়নি আমার, বলা উচিত ছিলো সেরামাল! সেরামালই সেরা জায়গায় থাকে।" হরিদাস আরো লজ্জাবতী!

মেজদা মৃদু হেসে বলেন, "কিন্তু প্রেসিডেন্সির যে আবার একটা বদরোগ আছে হে, মার্ক সীট্ মনের মতো না হলে ভর্ত্তি করে না!"

"আজ্ঞে সে তো জানিই।" বলে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো ভূষিমাল।

"সত্যি ছেলেটা এতো হাঁদা!" উঠতে বসতে সবাই বলে।

না বলে উপায় কি!

না বোঝে ঠাট্টা, না জানে কথা, না পারে মিশতে। একদিন সিনেমা দেখতে যেতে বলা হলো, বললো কিনা, "না ভাই, মার কাছে দিব্যি গেলেছি—কলকেতায় এসে সিনেমা-থিয়েটার দেখবো না।"

আমরা চোখ কপালে তুলে বলি, "কেন বলো তো?"

হরিদাস পরম বিজ্ঞের মতো বলে, "দেখলেই নেশা জন্মাবে, নেশা জন্মালেই উচ্ছন্ন যেতে হবে।"

শুনে রাসু রেগে উঠে বলে, "ও তার মানে আমরা সব উচ্ছন্ন যাওয়া ছেলে?"

হরিদাস বিপন্ন ভাবে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "না না সে কি কথা, তা' বলছি না তা' বলছি না।"

ওর বেশী কথা আর জোগায় না ওর।

পারে খালি হাঁটতে আর খাটতে।

বাড়ীতে কোনো কাজের কথা শুনেছে কি হরিদাস একপায়ে খাড়া। তা' সে —রাতদুপুরে বড় জ্যাঠামশায়ের ঘরের মশারি টাঙিয়ে দেওয়াই হোক, আর দুপুরে

# গল্পে ভালো আবার বলো

রোদ্দুরে এক মাইল রাস্তা হেঁটে পিসেমশাইয়ের জন্যে ডাব আনাই হোক। ক'দিনের মধ্যেই বাড়ীসুদ্ধু মহিলার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো হরিদাস। আর উঠতে বসতে আমাদের সঙ্গে হরিদাসের তুলনা-মূলক সমালোচনা শুনতে শুনতে হাড় জ্বলতে লাগলো আমাদের। মা থেকে সুরু করে সকলের মুখে এক কথা—"দেখ তোরা দেখ! হরিদাসের কাছে শেখ একটু।"

নসু বললো, "দেখ আশু, এর একটা প্রতিবিধান দরকার। এ অপমান আর সহ্য হচ্ছে না।"

আমি বললাম, "এ বিষয়ে—আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু করা যায় কি?"

"একদিন ওকে নির্জ্জনে কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে চাঁদা করে চাঁটি লাগাইগে চল।"

"দূর! বাড়ীতে প্রকাশ পেয়ে গেলে আমাদেরই চাঁটি খেতে হবে।"

"কিন্তু কী পাজী দেখেছিস? আমাদের সব অবাধ্য আর খারাপ ছেলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে গুণের অবতার সেজে বসে আছে।"

"দেখতে অথচ ভিজে বেড়ালটি! এ দিকে তো হাঁদাপেটা গাধারাম, কিন্তু পেটে পেটে শয়তানীটি দেখেছিস তো? সকালে যেই ছোটকাকার খাবার সময় শুনেছে লেবু নেই, অমনি না বলতেই ছুটে কিনে নিয়ে আসা হলো!"

"হুঁ শেষ পর্য্যন্ত করবেন তো ওই বাজার সরকারি, তাই এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছেন!"

"তা' ঠিক! ওই বুদ্ধি নিয়ে আর কতো হবে? আমাদের তো বাবা দোকান বাজারের নামেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।"

"ওর ওতেই আনন্দ! সেদিনকে দেখলি না—বনমালী সামনে থাকতেও মেজ-কাকার সার্ট নাকি আনতে লণ্ড্রীতে ছুটলো!"

"এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ঘুষি—" নসু বলে ওঠে, "স্রেফ্ একখানি প্রকাণ্ড

# গল্প ভালো আবার বলো

ঘুষি। ঘুষিটি লাগিয়ে দিব্যি গালিয়ে নেওয়া হোক—'ভালো-ছেলেগিরি চলবে না তোমার। আমাদের দলে মিশতে পারো তো থাকো, না হলে'—"

বলতে বলতেই দেখি হরিদাস আসছে।

চুপ হয়ে গিয়ে আমরা চোখে চোখে ইসারা করলাম, এখন নয় সময় বুঝে।

কিন্তু হরিদাসকে ঘুষি লাগানো আর হলো না আমাদের! সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ হরিদাসই একদিন আমাদের সকলের গালে ঠাশ্ করে এক বিরাট চড় বসিয়ে দিলো!

সে চড়ের জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছট্‌ফট্ করছি আমরা!

"এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ঘুষি—" । পৃঃ—২৩

# গল্প ভালো আবার বলো

নসু বলেছে শীগগিরই ও গেরিমাটি কিনে কাপড় ছোপাবে, রাসু বলেছে ও সুবিধে মতো একদিন গিয়ে হাওড়ার পুলের ওপর থেকে সোজাসুজি নীচের দিকে ঝাঁপ্ দেবে, আর আমি টিনচার আইডিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করা যায় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা করছি। হরিদাসের সঙ্গে একত্রে বাস করা আর সম্ভব নয়।

একটি চড়ে আমাদের তিনজনের গাল লাল!

আর হরিদাস এই বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়টি আমাদের গালে বসিয়ে দু'দিনের জন্যে দেশে গেছে মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

কি বলছো? একটি চড়ে তিনজনের গাল লাল হলো কি করে তাই জিজ্ঞেস করছো?

তা' হাতে করে তো ঠিক মারেনি—মেরেছে অন্য রকমে!

চড় মানে চড় নয়, চড় ওর রেজাল্ট।

এ বছর স্কুল ফাইন্যালে ফার্স্ট হয়েছে মাকড়তলা হাইস্কুলের হরিদাস খাসনবীশ!

আর আমাদের রেজাল্ট? সেটাও কি আমার মুখ দিয়ে বলিয়েই ছাড়বে?

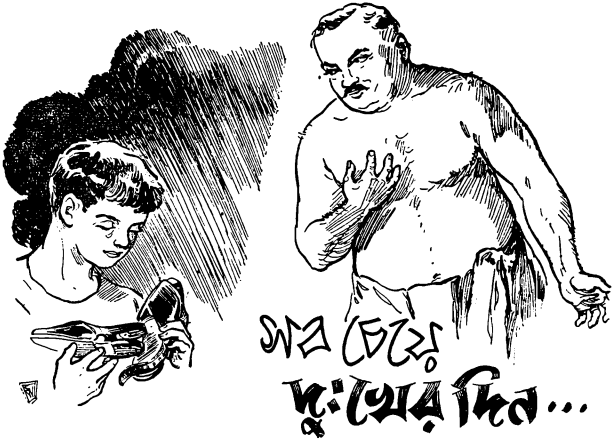


মামার বাড়ী যাওয়ার কথা উঠতেই জুতোর কথা উঠলো। মানে সাতুই কথাটা ওঠালো। মার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলে বসলো মামাবাড়ী সে যাবে না, কারণ তার জুতো জোড়াটা যে অবস্থায় এসে পেঁছেছে, তাতে আর যাই হোক প'রে মামার বাড়ী যাওয়া চলে না।

আবার শুধু মামাবাড়ী নয়, বিয়ে বাড়ী।

অসম্ভব!

কী চেহারা হয়েছে জুতো দু'পাটির! আটকাটা অষ্টাবক্র! ছাল ছিঁড়েছে সর্ব্বাঙ্গের, আর গোড়ালি নিয়েছে বিদায়। এইটিই এখন সাতুর একমাত্র সম্বল। আর দু'মাস পরে পুজো, সেই শুভদিনটি আসার আশায় দিন গুণছিলো সাতু, হঠাৎ এই নেমন্তন্ন পত্তরের আবির্ভাব!

ঊনতিরিশে শ্রাবণ সাতুর মামাতো দিদির বিয়ে।

# গল্প ভালো আবার বলো

মামার বাড়ী বিয়ের বার্ত্তা শুনলে সাতুদের মতো ছেলেদের—মানে বারো তেরো বছরের ছেলেদের মন কী উল্লাসে নেচে ওঠে! সে আর কে না বোঝে? সাতুরও উঠেছিলো, কিন্তু সে এক মিনিটের জন্যে, পরক্ষণেই চোখে ভেসে উঠলো—নিজের 'সু'র সু-চেহারাখানি। নাচতে গিয়ে মন যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। নাঃ—সাতুর যাওয়া হবে না!

তোমরা বোধহয় ভাবছো সাতু ভা-রী গরীবের ছেলে? তা কিন্তু মোটেই নয়, বেশ পয়সা-কড়ি আছে সাতুর বাবার! হলে হবে কি, সে পয়সা সাতুর বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। তাকে সেই ছেঁড়া জুতোয় তালি দিয়ে দিয়ে পুজো আসার অপেক্ষা করতে হয়।

তা'হলে বোধ হয় ভাবছো—সাতু হচ্ছে—বেচারী ধ্রুবর মতো ওর বাবার দুয়োরাণীর ছেলে?...উঁহু তা'ও নয়, ওর উপর ওর বাবার ভালোবাসার অভাব নেই, কিন্তু সব মাটি করেছে এক বাতিকে!

ভারী সর্ব্বনেশে বাতিক সাতুর বাবার।

বিলাসিতা বর্জ্জনের বাতিক! তাঁর মুখের বুলিই হচ্ছে—'বাবুয়ানা কোরো না বাপু, বাবুয়ানা কোরো না'। কবে নাকি ছেলেবেলায় সাতুর বাবা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ছিলেন, নন্-কোঅপারেশন করেছেন, পিকেটিং করেছেন, একবার নাকি দিন দুই তিনের জন্যে হাজত বাসও করেছেন। মোট কথা তিনি এক আদর্শবাদী লোক। সে আদর্শ হচ্ছে সাদাসিধে হওয়া।

কিন্তু আদর্শ এখন বাতিকে দাঁড়িয়েছে! ফলে সাতুর জীবন দুঃখময়!

সব কথা শুনলে বেচারা সাতুর দুঃখে তোমাদেরও বুক ফাটবে। তেরো বছর বয়েস হলো সাতুর, এখনো জীবনে একটি ফাউণ্টেন-পেনের অধিকারী হলো না সে! একবার তাড়াতাড়ি লেখার ছুতোয় মায়ের মাধ্যমে আবেদন করেছিলো বাবার কাছে। শুনে বাবা বলেছিলেন—ফাউণ্টেন নইলে তাড়াতাড়ি লেখা যায় না? এই কথা

# গল্প ভালো আবার বলো

বুঝিয়েছে তোমায় সাতু? তাকে জিজ্ঞেস করো গে, তার বাপ ঠাকুন্দা, ঠাকুন্দার ঠাকুন্দা চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনো ফাউণ্টেনে লিখেছে কি না? তাদের যদি দেরী করে করে লিখেও জীবন কেটে থাকে, সাতুরও কাটবে, তাদের যদি কোন কাজ আটকে না থেকে থাকে, সাতুরও আটকাবে না! ফাউণ্টেন পেন! হুঁ! যত্তোসব বিলাসিতা!

সাতু একবার বলেছিলো—পড়ার ঘরে একটা ঘড়ি থাকলে বেশ সুবিধে হয়। মায়ের ঘরের টাইমপীস্‌টা যদি মা সাতুর ঘরে স্থানান্তরিত করতে রাজী হন! ছাত্র-জীবনে ঘড়ির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলো সাতু। মা অরাজী হলেন না, কিন্তু বাবা এসেই যেই লক্ষ্য করলেন সাতুর টেবিলে ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করছে, অমনি টিক্‌ টিক্‌ করতে বসলেন ছেলেকে—'ঘড়ি কেন? ঘড়ির কি দরকার? ঘড়ি না হলে পড়ার অসুবিধে, এ কথার মানে! যে যুগে ঘড়ি ছিলো না, সে যুগে লোকে লেখাপড়া করতো কি না,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ পর্য্যন্ত ঘড়িটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন না বটে, কিন্তু জেরায় জেরবার সাতু মনের দুঃখে নিজেই তা' রেখে এলো এক সময়!

এ তো সামান্য দুটো উদাহরণ। সকালবেলা ঘুম ভাঙা থেকে রাত্তিরে ঘুমোনো পর্য্যন্ত সাদাসিধে হবার জন্যে যে কতো পরিশ্রম করতে হয় সাতুকে! আরো দু'টি ছোটো ভাইবোন আছে তার, কিন্তু তারা এখনো মার রাজ্যের প্রজা, সাতুরই প্রমোশন হয়েছে মাতৃরাজ্যের এলাকা থেকে পিতৃরাজ্যের এলাকায়। কাজেই এখনো—এ যুগেও ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে হয় সাতুকে, বাড়ীতে কাচা সার্ট পরে স্কুলে যেতে হয়, কদমছাঁট করে চুল ছাঁটতে হয়।

সে যাই হোক, যা হয় তা' হবে, কিন্তু এখন কী হবে? এই জুতো সমস্যার?

# গল্প ভালো আবার বলো

'মামার বাড়ী যাবে না', কথাটা তো নেহাৎ অভিমানের কথা. যাবার জন্যে যে প্রাণটা ছটফট করছে! কাজে কাজেই মায়ের কাছে এই আস্ফালন!

—তোমরা যেও! আমার জন্যে চারটি চাল ডাল আর একটা উনুন আর হাঁড়ি আলাদা করে রেখে যেও।

মা হেসে ফেলে বললেন—উনুন আর হাঁড়ি নিয়ে তুই করবি কি রে?

—কেন ভাতে ভাত রেঁধে খাবো!

—বেশ বলেছিস! ভালোই হবে, তুই রান্না শিখে ফেললে আমাকে আর খাটতে হবে না। যাক গে, কই তোর জুতোটা আনতো, দেখি কতটা ছিঁড়েছে!

সাতু গম্ভীর মুখে জুতোটা এনে মার সামনে রাখে।

—ওমা তাই তো! সাতুর মা বলেন—প'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়িস্, অতো লক্ষ্য করিনি, জুতোটার যে আর পদাথ নেই রে! এই প'রে আবার মামার বাড়ী যাওয়া যায় না কি! আচ্ছা, তুই ভাবিসনি, নতুন জুতো কেনার কথা আমি তোর বাবাকে বলে রাখছি!

সাতু কিঞ্চিৎ আশা প্রাণে নিয়ে সাধু ভাষায় যাকে বলে 'স্পন্দিত বক্ষে', সেই ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সাতুর বাবা শ্রীকণ্ঠবাবু যেই এলেন, অনুপমা বললেন—দেখো, আমাদের পাটনায় যাবার আগে সাতুর একজোড়া জুতো না কিনলেই তো নয়!

—জুতো! কেন? পুজোর এখনো দু'মাস দেরী, এখ্খুনি জুতো মানে?

—আহা! পুজোর দু'মাস দেরী আছে বলে কি জুতোটা বুঝে সুঝে জবাব দেবে? তোমার সব অদ্ভুত কথা! জুতোটার কী হাল হয়েছে দেখেছো তাকিয়ে? ঐ জুতো প'রে কখনো বিয়ে বাড়ী যেতে পারে?

শ্রীকণ্ঠবাবু তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিলেন কথাটা—তোমাদের যত সব বাড়াবাড়ি! ওই জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে আমার বনে না। বাড়ী থেকে পা বাড়াবার কথা

# গল্প ভালো আবার বলো

উঠলেই অমনি—শাড়ী চাই, জামা চাই, জুতো চাই, গেঞ্জি চাই, এ কী রে বাবা! ছেলেমেয়েদের সাদাসিধে হতে শেখাতে হয়, বিলাসিতা বড় বিশ্রী জিনিস!

অনুপমা তর্কের সুরে বললেন—বাঃ, তাই বলে ছেঁড়া কুটি কুটি জুতো প'রে মামার বাড়ীর বিয়েতে নেমন্তন্নে যাবে?

—কই দেখি কেমন ছিঁড়েছে! সাতু! সাতু!

সাতু যদিও কাছাকাছিই ছিলো, তবু আরো দু' একবার ডাকের অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিলো! শ্রীকণ্ঠবাবু আবার ডাকলেন—সাতু, কই দেখি, কি নিয়ে তোমার মায়ের এতো দুর্ভাবনা?

—বাবা কিছু বলছেন? সাতু যেন আকাশ থেকে পড়ে!

—হ্যাঁ! শুনলাম না কি মামার বাড়ী নেমন্তন্ন যেতে ছোট্ট খুকিটার যেমন নতুন সিল্কের ফ্রক চাই, তোমারও তেমনি নতুন জুতো একজোড়া চাই!

রাগে দুঃখে সাতুর চোখে জল এসে গেলো, ছোট্ট খুকিটার সঙ্গে ওর তুলনা! অন্য সময় হ'লে হয়তো বা অভিমানের বশে 'আমার কিছু চাই না' বলে চলেই যেতো, কিন্তু এ যে বড়ো মোক্ষম সময়!...ওর মামাতো ভাইদের কথা মনে পড়লো। যদিও খুব ছোটবেলায় একবার পাটনায় গিয়েছিলো, তবু মনে আছে মামাতো ভাই বোনদের কী সাজ পোশাকের ঘটা!

অতএব সাতু ধাঁ করে জুতো জোড়াটা নিয়ে এলো।

—হুঁ, সোলটা একটু ক্ষয়ে গেছে বটে—শ্রীকণ্ঠবাবু অম্লান বদনে সেই আটকাটা অষ্টাবক্রের একটি পাটি হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলেন—মুচি ডেকে একটু মেরামত করে নিলেই চলে যাবে!

অনুপমা ব্যস্ত হয়ে বলেন—কেন বাবু, সাতু আমার একটা তালিমারা জুতো প'রে নেমন্তন্ন বাড়ী যাবে? আর দু'মাস বাদেই তো দিতে কিনে, সেইটাই নয় এখন দাও? পুজোয় আর দিও না!

# গল্প ভালো আবার বলো

শ্রীকণ্ঠবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—ছেলেপুলেকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয় সে আর তুমি শিখলে না! পুজোর সময় দেবো না, এখন দেবো, ও সব তো কোনো কাজের কথা নয়, দিলে কি সাতুকে আমি এখন তিন জোড়া জুতো কিনে দিতে পারি না? কিন্তু দেবো কেন? কেন প্রশ্রয় দেবো বাবুয়ানার? ...নেমন্তন্ন যাবে বলে নতুন জুতো জামা কিনতে হবে, ওসব হচ্ছে মেয়েলি কাণ্ড!

—কী মুস্কিল! বাবুয়ানা কোথায় দেখলে? ওটা যে ছিঁড়ে গেছে!

—ছিঁড়ে গেছে, জুড়ে নেবে! কি বলিস সাতু? খুব চলে যাবে কেমন?

সাতুর আর কিছুই বলবার ছিলো না, তবু নিতান্ত মরিয়া হয়েই বলে ফেলে—ওরা সব ভালো ভালো পরবে—!

—হা হা হা! শ্রীকণ্ঠবাবুর উচ্চ হাসির শব্দ কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকে—শোনো একবার ছেলের আর্গুমেণ্ট! ওরা যদি বিষ খায়, তুই

সাতু জুতো জোড়াটা নিয়ে এলো [ পৃঃ—৩০

# গল্প ভালো আবার বলো

খাবি?...ওরা যদি বাবুয়ানার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে ভাবে চন্দন পুকুরে ডুবে আছি, তুই তাই ভাববি?

সাতু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, বাবার এ হেন উচ্চাঙ্গের কথার মানে ধরতে পারে না!

শেষ চেষ্টা করলো সাতু যাবার আগে।

—আমার অসুখ করেছে, আমি যাবো না!

অনুপমা অসুখের কারণ অবশ্য ধরেছেন, ছেলের ওপর সহানুভূতি আর স্বামীর ওপর রাগে অস্থির হয়েও পড়েছেন, কিন্তু করেন কি? এক ঘণ্টা পরেই ট্রেণ! এখন আবার জুতো জুতো রব উঠলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো শ্রীকণ্ঠবাবু সক্কলের যাওয়াই রদ করে দেবেন। হয়তো বলে বসবেন—পায়ের নীচে জুতো, সে জিনিসে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে বলে যে সব আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখানো যায় না, তেমন আত্মীয়ের বাড়ী না যাওয়াই ভালো!

কিছু বলা যায় না, অনায়াসে একথা বলতে পারেন শ্রীকণ্ঠবাবু!...এই 'রায়'টি দিয়ে ট্রেণের টিকিটগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে "গীতার গান্ধীভাষ্য" নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে বসতে পারেন!

অথচ অনুপমার এই প্রথম ভাইঝির বিয়ে! তা ছাড়া আজ ছ' সাত বছর বাপের বাড়ী যাননি!

অতএব ছেলেকে চুপি চুপি প্রবোধ দেন,—আচ্ছা চলনা তুই, যেতে মাত্তরই তো কেউ তোর জুতো দেখছে না, ওখানে গিয়ে না হয় আর কাউকে দিয়ে কিনে দেবো! পাটনা তো আর অজ পাড়াগাঁ নয় যে কিছু পাওয়া যায় না।

এই প্রলোভনে ভুলে সাতু সেই জুতোকেই ঝেড়ে ঝুড়ে প'রে রওনা দিলো মামার বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

রাত্রের ট্রেণ!

# গল্প ভালো আবার বলো

বাইরের দৃশ্য কিছুই চোখে পড়ে না, তবু সাতু জানালার কাঁচে নাক চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে রাত্তির সাড়ে বারোটা অবধি!

সাত জন্মে কোথাও যাওয়া হয় না, রেলেও চড়া হয় না, রেলে চড়তে এতো মজা লাগে! মজার ব্যাপার তো আগাগোড়াই! দিদিমার আদর, মামাবাড়ীর সেই হৈ চৈ আহ্লাদ আমোদ, তার উপর একটা বিয়ে—যা নাকি জ্ঞান হয়ে কখনো দেখেনি সাতু!

কলকাতায় এক আধটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে বটে বাবার সঙ্গে গিয়ে, কিন্তু সে তো একবারের জন্যে গিয়ে, কেবল মাত্র একপাত খেয়ে আসা! 'বিয়ে বাড়ী'র হৈ চৈ তো দেখেনি কখনো! এ আস্ত একটা বিয়ে বাড়ীতে সাতদিন থাকা!

কী আনন্দ! কী মজা!

শুধু—শুধু—যদি জুতো জোড়াটা আর একটু আস্ত থাকতো!

অনুপমা ছেলেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন বটে, মিথ্যে ভোলাবো বলে নয়—সত্যি করবো ভেবেই দিয়েছিলেন। কিন্তু এতো বছর পরে বাপের বাড়ী গিয়ে, আর এক-যোগে মা বোন ভাই ভাজ পিসি মাসী পিসতুতো মাসতুতোর দর্শন পেয়ে, ছেলের কথা ভুলেই গেলেন বেমালুম!...সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মাকে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া সাতু বেচারার সাধ্যাতীত!

মামার বাড়ী পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বাপের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো সাতু. গিয়ে পড়লো মামাতো ভাই বোনদের এলাকায়।

তা সত্যি বলতে কি, খুব যত্ন সুরু করলো তারা এদের!—সাতুকে আর তার ছোটো ভাই বোনেদের! বিশেষ করে সাতুর আদর বেশী, কারণ ও তেরো বছর বয়সেই ক্লাশ টেন্‌এ পড়ছে! ওকে সমীহ করা দরকার।

# গল্প ভালো আবার বলো

কিন্তু কাল্ করলো ন'মামার ছেলে আশীষ! সব সময় ছিম্‌ছাম্ ফিট্‌ফাট্ চোস্ত সাজ, চোস্ত বুলি। আশীষ ঠকে যায় খালি ক্লাশে ওঠার বেলায়। তাই হয়তো সাতুর প্রতি ওর ভিতরে ভিতরে একটু 'দীর্ঘ ঈ' ছিলো। জুতো জোড়াটা দেখেই ভাবলো—রোসো নিই এক হাত!

সিঁড়ির তলায় অন্ধকার কোণের মধ্যে রেখে দিয়েছিলো সাতু, কি করে যে ওর চোখে পড়লো! পায়ে করে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে সকলের মাঝখানে এনে ফেলে ফিক্ ফিক্ করে হেসে বলে উঠলো—এই ঘীয়ে-ভাজা মালটি কার হে?

সর্ব্বনাশ!

সাতু আর নেই! হায় ভগবান অতো লুকিয়ে রেখেও এদের চোখে পড়ে গেলো! আশীষের সঙ্গে তো তার কোন শত্রুতা ছিলো না!

কিন্তু ছেলেপুলের ব্যাপার! একবার যদি একজনকে অপদস্থ করবার ছুতো পাওয়া যায়, তা' হলে আর রক্ষে নেই! সবাই সেই নেশায় মেতে ওঠে! অতএব সব কথা বন্ধ হয়ে চললো সাতুর জুতোর সমালোচনা!

—আরে তাইতো! ফার্ষ্টক্লাশ মালটি তো! কোথায় পেলিরে আশীষ? কার?...কার?...সাতুর? তাই নাকি?

—বেড়ে জিনিসটি তো! রীতিমত বনেদী ব্যাপার! তোর জন্মাবার আগেই কেনা হয়েছিলো বোধহয়,—না রে সাতু?

—আরে না না! এ একেবারে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য! বোধহয় ক্লাইভের আমলের!

—তাই কি? আমার মনে হচ্ছে মান্ধাতার আমলের!

—হ্যাঁরে সাতু, সাল তারিখ লেখা নেই কোথাও?

আচ্ছা এমন মহামূল্য জিনিসটা আর ব্যাভার করে নষ্ট করছিস কেন ভাই, মিউজিয়মে পাঠিয়ে দে না?

# গল্প ভালো আবার বলো

—আরে না না, সাতু ওটাকে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবার মতলবে বিয়ে বাড়ীতে এনেছে! কতো করে টিকিট করবি রে সাতু? চার চার পয়সা?

ছেলেগুলি ছোটো হ'লে কি হবে কথাগুলি ছোটো নয়। তা ছাড়া—একটা ছুতো পেয়ে প্রত্যেকেই দেখিয়ে দিতে চায় সে কতো ইয়ার্কি শিখে ফেলেছে!

বলবার মুখও যে সকলেরই আছে!

সকলের পায়েই যে চকচকে ঝকঝকে নতুন জুতো! সু, কাবুলী, এ্যালবার্ট, শিলপার, আধা কাবুলী, আধা সু, হরেক রকমের জুতোর বাজার!

কতো কষ্টে যে চোখের জলকে চোখে আটকে রাখে সাতু—সে সাতুই জানে!

কিন্তু এইখানেই কি শেষ?

জুতো প্রসঙ্গ মামাদের কান পর্য্যন্ত পেঁছয়।

বিয়ের আগের দিন ছোটোমামা বাড়ীসুদ্ধু ছোটো ছেলেদের নিয়ে বেরিয়েছেন বেড়াতে, হঠাৎ বড়োমামার ছেলে বিলু বলে ওঠে—ছোটকা, তুমি তো সবাইকে পাটনার দ্রষ্টব্য দেখাতে বেরিয়েছো, আমাদের সাতু মাষ্টার কী ফাইন একটি কলকাতার দ্রষ্টব্য বয়ে নিয়ে এসেছে দেখেছো?

—কলকাতার দ্রষ্টব্য! সে আবার কি!—ছোটোকাকা বলেন।

—ওই যে সাতুর পায়ে!

একযোগে সকলের চোখ পড়ে সাতুর পায়ে!

দুর্ভাগ্যের কথা, পাটনার টান হাওয়ার গুণেই হোক, অথবা অজানিত কোনো কারণেই হোক জুতো জোড়াটির অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে, দুটি জুতোর দুটি কোণ থেকে উঁকি মারছে একটি করে কড়ে আঙুল!

এই দৃশ্যে যা হাসির ঝড় বয়ে গেলো সে বোধহয় আন্দাজেই বুঝতে পারছো

# গল্প ভালো আবার বলো

তোমরা? পৃথিবী তো—সেই মা জানকীর আমলের পর থেকে আর একবারও দ্বিধা হননি, তবু এতোকাল পরেও সাতু মনে মনে সকাতর প্রার্থনা করতে থাকে 'ধরণী দ্বিধা হও!'

তবু সাতুকে সাত দিন ধরে থাকতেই হলো মামার বাড়ীতে। অবিশ্যি বিয়ের উৎসাহ আর নতুন বর আসার উত্তেজনায় সাতুর ব্যাপারটা ভুলে গেলো সবাই! কিন্তু সাতু কি ভুলতে পারে, কোনো ব্যাপারেই সামনে এগিয়ে যাবার সাহস তার নেই, সব সময় আছে সকলের পিছনে! যতোক্ষণ সম্ভব খালি পায়ে বেড়াচ্ছে, আর মনে মনে দিন গুণছে কবে সাত দিন কাটবে!

অথচ প্রথম মা যখন বলেছিলেন সাতদিন থাকা হবে, কতো হতাশ হয়েছিলো সাতু, ভেবেছিলো, অন্য ছেলেরা কেমন এক মাস দু'মাস মামার বাড়ী থেকে আসে গ্রীষ্মের বন্ধে, পুজোর বন্ধে!

অবশেষে ফেরার দিন এলো।

সেই জুতো প'রেই ফের ট্রেনে উঠতে হলো সাতুকে, আর ট্রেন চলার কিছু পরেই পা ঝুলিয়ে বসে থাকা ছেলের পায়ের দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই শ্রীকণ্ঠবাবু একটু আপশোসের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—

—তাইতো রে সাতু, তোর জুতোটা যে দেখছি, বড্ডোই ছিঁড়ে গেছে! ইস্! এতোটা—এমন হলো কখন? আঙুল দুটো যে, সবটাই বেরিয়ে পড়েছে! মামাতো ভাইদের পাল্লায় পড়ে খুব হেঁটেছিস বুঝি ক'দিন?

কিন্তু এতো প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? উত্তর দেওয়ার অবস্থা কি আর আছে সাতুর? সমুদ্র যে উত্তাল হয়ে উঠেছে!

সাতুর মা অনুপমার এতোদিনে মনে পড়ে কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছেলেকে এনে-

# গল্প ভালো আবার বলো

ছিলেন, কিন্তু নিজের দোষ তো আর স্বীকার করতে পারেন না, তাই স্বামীর উপর রেগে বলেন—কেন, ওই তো তুমি চাও! সকল ছেলের কাছে তোমার ছেলের মুখখানা ছোট হয়ে থাকে এই তো ইচ্ছে তোমার!

নাঃ—শ্রীকণ্ঠ-বাবুও অপ্রতিভ হয়েছেন!

ছেলের পা দেখে যতোটা না হোক, ছেলের মুখ দেখে!... তাই আর বাবু-য়ানা বর্জনের উপদেশ দেন না, চুপচাপ থাকেন।

আরও কিছু-দিনের পরের ঘটনা। কলকাতায় ফিরেও সাতু হয়ে থাকে মনমরা।

ছেলের মুখে হাসি ফোটাতে

তোর জুতোটা যে দেখছি, ছিঁড়ে গেছে! [ পৃঃ—৩৬

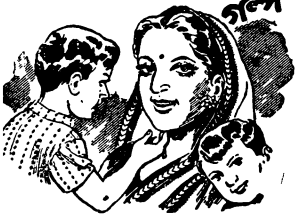

# গল্প ভালো আবার বলো

আর ছেলেকে তাক্ লাগিয়ে দিতে শ্রীকণ্ঠবাবু ঘুমন্ত সাতুর পায়ের তলায় কাগজ ফেলে মাপ নিয়ে একদিন চুপি চুপি একজোড়া জুতো এনে হাজির করলেন নগদ আঠারোটি টাকা দিয়ে।

সুন্দর সৌখিন "আমেরিকান কট্ কাবলী সু"!

সাতুর তেরো বছরের জীবনে এমন সুন্দর আর এত দামী জুতো কখনো পরেনি! কিন্তু সেই জুতো জোড়াটা সামনে নিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদে সাতু!

ওর এই তেরো বছরের জীবনে এর চেয়ে দুঃখের দিন আর আসেনি।

অনেকদিন থেকেই মনে মনে সংকল্প করছিলো জগদীশ, আজ একেবারে মনস্থির করে ফেললো। হ্যাঁ, নিরুদ্দেশই হবে সে! নিশ্চয়ই হবে! কেন নয়? বেচারা জগদীশের মতো দুঃখী হতভাগ্য, সংসারের সকলের অরুচি ছেলে নিরুদ্দেশ হবে না তো কি নিরুদ্দেশ হবে ওই চৌধুরীদের 'গোপালধন'?

হ্যাঁ, মা বাপ থেকে সুরু করে ঠাকুমা, পিসি, আত্মীয়-স্বজন, চাকরবাকর সক্কলে ওকে ডাকে 'গোপালধন' নামে। এরকম আদিখ্যেতার কথা শুনে রাগে হাড় জ্বলে গেলেও, নিজের সঙ্গে তুলনা করে চোখে জল এসে যায় জগদীশের।

তা' তার দুঃখের কথা যদি শোনো তোমাদেরও চোখে জল এসে যাবে। একেই তো ঠাকুমা, পিসি তো দূরের কথা, জগদীশের মা-বাপই নেই। আত্মীয়-স্বজন বলতে

# গল্প ভালো আবার বলো

কেউ আছে কি না, তা'ও তার জানা নেই। না থাকাই সম্ভব, চৌধুরীদের মতন অতো টাকা তো তাদের নেই। টাকা না থাকলে আত্মীয়-স্বজন থাকে না, এটা জগদীশ তার ছোড়দার পড়ার বই থেকে একদিন জেনে ফেলেছে।

যাক যা বলছিলাম।

এ জগতে জগদীশের থাকবার মধ্যে আছেন খালি চারটি দাদা। তা, দাদা তো নয়, যেন চারটি বোমা! শুধু বারুদ ভরা বোমা নয়, একেবারে পলতেয় আগুন ধরানো বোমা, বার্ষ্ট্ করলেই হলো! সঙ্গে-সঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন আর অগ্নিবর্ষণ।

আর এ অগ্নি, আর-কারো ওপর নয়, সর্ব্বদা জগদীশের ওপরই বর্ষিত হচ্ছে। সকলের মুখেই অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে—

"জগা! জগা! জগা!"

হা জগা, জো জগা!

'জগা' ভিন্ন ওঁদের মুখে আর বাক্যি নেই।

কি? তোমরা বুঝি ভাবছো এটা তাঁদের সাধের ছোট ভাইয়ের প্রতি আদরের চিহ্ন? হায় গোবিন্দ! তা'হলে বরং একদিন জগদীশদের বাড়ী গিয়ে দেখে এসো এ শুধু ফাই-ফরমাসের জন্যে হাঁক পাড়াপাড়ি। বুঝলে?

"জগা এতো বেলা অবধি আয়েস করে ঘুমোচ্ছিস মানে? কেন, উঠে এই খোকাটাকে একটু ধরলেও তো তোর বৌদির কিছু সুবিধে হতো?"

(যেন বৌদির সুবিধের জন্যেই জগদীশের নরদেহ ধারণ।)

পরক্ষণেই শুনতে পাবে "জগা! এ্যাই জগা! সকাল থেকে করিস কি? দুধের বালতিটা নিয়ে একটিবার গোয়ালার ওখানে যেতে পারিস না? তা'হলে দুধটা একটু খাঁটি পাওয়া যায়! চোখের আড়ালে এক সের দুধে যে আড়াই সের জল ঢালছে রে।"

# গল্প ভালো আবার বলো

(ওঁরা নিজেরা গেলে যেন কাজটা হতে পারে না।) না নিজেদের দিক থেকে কর্ত্তব্যের কথা ভেবেই দেখেন না ওঁরা!

দুধের শোক মিটতে না মিটতেই সুরু হবে 'বাজার প্রসঙ্গ'।

"উঃ! ঘরে-বাইরে খাটতে খাটতে জান গেলো আমাদের। কেন, জগা সারা সকাল কি করে? জগা পারে না বাজারটা করতে? বিদ্যেবুদ্ধির যা বহর দেখছি—ভবিষ্যতে করতে তো হবে ওই বাজার-সরকারি! বাড়ীর বাজারটা করে হাত পাকানোই ভালো!"

আবার একটু পরেই—সক্ষোভ চীৎকার (এটা মেজদার) "ঈস্! জুতোটার কী অবস্থা হয়ে আছে! এই পরে ভদ্রলোক অফিস যেতে পারে? ছ্যা ছ্যা! বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে এটুকু দেখে? এদিকে এটি কি? ওঃ! জগদীশবাবুর জুতো! আমি ভাবছিলাম, আর্শীটা পড়ে রয়েছে বুঝি! বাঃ বাঃ! বেড়ে। তা' নিজের জুতোজোড়া একটু কম পালিশ করে—দাদা গুরুজন, তার জুতোয় বুরুশটা একবার ঘষলে অবিশ্যি জাত যেতো না!"

বেচারা জগদীশ যদি এ সময় ব্যস্ত হয়ে কর্ত্তব্য পালনে ছুটে আসে, মেজদা 'থাক থাক' করে সজোরে তার হাত থেকে বুরুশটা কেড়ে নিয়ে, নিজেই পায়ে পরা জুতোটা ঘসঘস করে ঘষে নিয়ে মস্‌মস্ করে বেরিয়ে যাবেন।

ওই যে আবার সুরু হয়েছে—

"এক্সাসাইজ করে কি হবে? ওহে ও জগদীশবরবাবু, এক্সাসাইজ করে কি হবে? ডাকাতি? না গুণ্ডামী? কাজের বেলায় তো কাণাকড়ার উৎসাহ দেখি না! এই যে—সারা বাড়ী ঝুলকালিতে একেবারে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে, এই ঝুলগুলো একটু সাফ্ করলেও তো বুঝি, এক্সাসাইজের কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে।"

(যেন ব্যায়ামের চরম সার্থকতা কড়ি-বরগার ঝুলকালি ঝাড়ায়।)

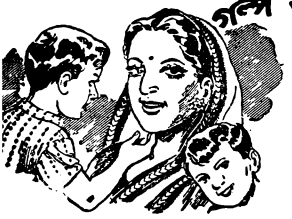

# গল্প ভালো আবার বলো

ওঁদের দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হবার ভয়ে জগদীশ সাধ্যপক্ষে ঘরের কোণ ছেড়ে বেরোতে চায় না, কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? কোণের দিকেও উঁকি দেবেন ওঁরা, "ওঃ এই যে, শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া হচ্ছে। বাঃ চমৎকার! কেন? বলি অসময়ে (ওঁদের কাছে অবশ্য সুসময় বলে কোনো অবস্থা নেই, সবই অসময়) গল্পের বই পড়া কেন? এ সময়টা বাবলু গাবলুকে খানিক পড়ালেও তো গেরস্তর কিছু উপকার হয়?"

এই হলো—জগদীশের প্রতি তার দাদাদের স্নেহ ভাবের নমুনা।

কিন্তু নমুনা দিয়ে কতোই আর বোঝানো যায়? কতটুকুই বা? ঘটি ডুবিয়ে কি সমুদ্র মাপা যায়? না কি ঘটি-ডোবানো জলে

সজোরে তার হাত থেকে বুরুশটা কেড়ে নিয়ে...[ পৃঃ—৪১

# গল্প ভালো আবার বলো

সমুদ্রের রং গড়ন বোঝানো যায়? এইটুকু শুধু শুনিয়ে রাখি সংসারের পাণ থেকে যদি চুণ খসলো, তো দাদারা জগদীশের ওপর মারমূর্ত্তি। কারণ? কারণ, জগদীশ বুঝি দু'বার স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল্ করেছে।

আচ্ছা, মানুষ কি ফেল্ করে না?

ফেল্ আছে বলেই না পাশ কথাটার মানে আছে? কিন্তু সে কথা কে বোঝাবে দাদাদের? যদি কোনো কাজের বেলায় দৈবাৎ জগদীশ "আমি পারবো না" বলে ফেলেছে, অমনি হৈ হৈ পড়ে গেলো, "কী! পারবি না? বলতে লজ্জা করলে না? সাতবার ফেল্ করে লজ্জা নেই!"

শোনো কথা!

পাশ করতে না পারলেই লোকে ফেল্ করে। তবে আবার 'পারবো না' বলতে লজ্জা কি? পড়া করতে যারা অপারগ, তারা সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হবে এমন কোনো আইন আছে?

সে যাক।

এই দাদারা ছাড়াও তিনটি বৌদিও আছেন জগদীশের। দাদারা যদি জ্বলন্ত বোমা তো বৌদিরা আগুনের ফুলঝুরি!

তাঁদের তিনজনের মুখে এক কথা "ছোট ঠাকুরপোর দ্বারা যদি কোনো কাজ হয়।" শোনো! শোনো তোমরা! তাঁদের মতে কাজ মানে তিন তিরিক্ষে ন'টি গুণের গোপাল গোপালীর যাবতীয় চাহিদা মেটানো।

যথা?

যথা কান্না ভোলানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, স্কুলে পৌঁছনো, আবদার ধরলে তন্মুহূর্ত্তে চকোলেট্ এনে দেওয়া, সর্দ্দি লাগলে তন্মুহূর্তেই ডাক্তারবাড়ী নিয়ে যাওয়া, কী নয়? তাই কি মিষ্টি কথার চাষ আছে?...শুধু ব্যঙ্গ আর বকুনি।

● নিরুদ্দেশ যাত্রা

# গল্প ভালো আবার বলো

এতেও যদি মানুষ নিরুদ্দেশ না হয় তো কিসে হবে?

খবরের কাগজের হারানোপ্রাপ্তি নিরুদ্দেশের পাতাটাই আগে খোলে জগদীশ। দেখে—নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটিকে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছেলেই হয়) কী আকুল প্রার্থনাতেই না ডাকাডাকি হচ্ছে!

হুঃ। নিরুদ্দেশেরা অতো বোকা নয় বাবা যে, তোমাদের ওই মিছে কান্নার প্যানপ্যানানিতে ভুলবে। নির্ঘাৎ তারা আর ফিরে আসে না!—যদি আসবেই তো কাগজে কেন সে খবর জন্মেও কখনো থাকবে না? আহ্লাদ করেও তো জানাতে পারে মানুষ, "ওগো আমাদের হারানো ছেলে ফিরে এসেছে।"

কক্‌খনো না! ফিরে কেউ আসে না।

কিন্তু—তা' হলে যায় কোথায়? এই যে প্রতিদিন রাশ রাশ ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, তারা কোথায় যাচ্ছে, কি খাচ্ছে, কি পরছে, কোথায় থাকছে! ভেবে ভেবে আর কূলকিনারা পায় না জগদীশ। তবে আজকে সে স্থিরসংকল্প করে ফেলেছে। নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে সে ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয়ই সেই নিরুদ্দিষ্টদের ঘাঁটিটা আবিষ্কার করে ফেলবে, যেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘরপালানো ছেলেরা গিয়ে আড্ডা গাড়ছে।

আজই হঠাৎ জগদীশ স্থিরসংকল্প করে ফেললো কেন, তার কারণ আছে। সেই কথাটাই বলি। আজ জগদীশের এক বন্ধু ওকে সিনেমা দেখার নেমন্তন্ন করেছিলো। সেও ফেল হওয়া ছেলে, পয়সা তাদের কারোরই নেই, সে তার জামাইবাবুর সূত্রে সিনেমার দু'খানা 'পাশ' জোগাড় করেছে।

মনটা তাই আজ একটু ভালো ছিলো জগদীশের।

নাইবার ঘরে ঢুকে সাবানটা নিয়ে একটু দেরী করে ফেলেছিলো। ওমা!

# গল্পে ভালো আবার বলো

একটি আগুনের ফুলঝুরি সুরু করলেন, "বাড়ীসুদ্ধু সবাই বুঝি আজ গা-ধোওয়া কাপড়-কাচা বন্ধ রাখবে ছোটঠাকুরপো? এত সাবান মাখার ঘটা কেন? বিয়ে করতে যাবে নাকি?"

ব্যস্! একটি থেকে তিনটি ফুলঝুরি জ্বলে উঠলো। কী হাসাহাসির ঘটা!

রেগে গন্‌গন্ করে বেরিয়ে এলো জগদীশ, হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে বসলো, "আমার যতো ইচ্ছে দেরী করবো, যা খুশি তাই করবো! কী রাইট আছে হাসবার?"

হ্যাঁ, বলে ফেলেছে জগদীশ।—

মনে তো ভরসা আছে নিরুদ্দেশ হবে, তার ওপর আজ 'সি নে মা দেখবো দেখবো' মেজাজ। জন্মের শোধ একবার বলে নেবার বাসনা তার আজন্মের!

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্!

আমার যতো ইচ্ছে দেরী করবো, যা খুসি তাই করবো!

# গল্প ভালো আবার বলো

তিন দু'গুণে ছ'পাটি দাঁত মুহূর্তে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে; মানে আর কি মুখের মধ্যে। তার বদলে বড়ো বড়ো হয়ে বেরিয়ে এলো ছ'টি চোখ।

"কী বললে? কী বললে শুনি?"

"যা ঠিক তাই বলেছি।" বলে গট্ গট্ করে চলে গেল জগদীশ।

এরপর বুঝতেই পারছো।

যা হবার তাই। দাদারা এসে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'!

"এতো উদ্ধত হয়ে গেছো তুমি?...এতো অবিনয়ী?...গুরু লঘু জ্ঞান নেই তোমার? রোসো মজা দেখাচ্ছি তোমায়!" ইত্যাদি ইত্যাদি। বকুনি আর থামে না।

এই ডামাডোলের মাঝখানে কে পারে ফর্সা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যেতে? বন্ধু নরহরি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যাপার দেখে প্রমাদ গণলো। ব্যাপার তো গুরুচরণ! জানলায় টোকা, বানানো কাসি, রাস্তার ঢিল কুড়িয়ে টুক্ টুক্ করে ভিতরে ফেলা, সব কিছু করেও বিফলমনোরথ হয়ে চলে গেল নরহরি। আর দাদাদের বাক্যবাণ বর্ষণ সাঙ্গ হলে জগদীশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো পৌনে সাতটা।

নিরুদ্দেশ হবার সংকল্প এতেও যদি দৃঢ় না হয়, কিসে হবে?

ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে জগদীশ ভাবতে থাকে কখন সুবিধে? রাতের অন্ধকারে, না দিনের গোলমালে?

ঠিক এই চিন্তার সময় ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে, হ্যাঁ, ঈশ্বরপ্রেরিত ছাড়া আর কিছু নয়, হুড়মুড় করে এসে হাজির হলেন মেজদার শ্বশুরবাড়ীর একটি বাহিনী। অদৃষ্টের পরিহাস, তাঁরা এলেন সিনেমা ফেরৎ। ব্যাঁটরা থেকে ভবানীপুরে এসেছেন সিনেমা

দেখতে; এতো রাতে আর ফিরে যাবেন না। এখানে খাবেন, শোবেন, কাল সকালে আদিগঙ্গায় স্নান সেরে, 'মা কালী'-দর্শন করে তবে যাবেন।

—অতএব?

অতএব জগা।

ছুটোছুটি, হাঁকা-হাঁকি, লাফালাফি, এ সমস্ত ডিউটিই তো জগদীশের।

"এই জগা, ছুটে গিয়ে আগে টাকা চারেকের খাবার নিয়ে আয়। তারপর ঝাঁ করে বাজারে গিয়ে ঘী নিয়ে আয় সের খানেক, আলু দু'সের, ডিম এক ডজন; আর শোন, পোয়া-আড়াই রাবড়ী—আচ্ছা, আর এক-খানা নোটও রাখ, এক-টাতে বোধহয় হবে না।"

দু'খানা নোট বাড়িয়ে দেন মেজদা। মেজদা আজ কল্পতরু।

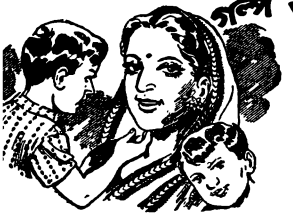

# গল্প ভালো আবার বলো

গম্ভীরমুখে উঠে টাকাটা নিলো জগদীশ, জামা গায়ে দিল নীরবে, বেরিয়ে গেলো গট গট করে। পিছনে মেজবৌদির আর্ত্তনাদ শোনা গেলো, "ভালো করে সব শুনেছো তো ছোট ঠাকুরপো—", কিন্তু শোনবার জন্যে দায় পড়েনি জগদীশের, ভগবান ওকে নিরুদ্দেশ যাত্রার পাথেয় জোগাড় করে দিয়েছেন। এই দশ টাকার নোট দু'খানা সম্বল করেই সে বাড়ী থেকে হাওয়া হবে।

—কিন্তু কি করে লোকে নিরুদ্দেশ হয়?

দোকানের উল্টোমুখে চ'লে অনেকখানি হে'টে—অচেনা একটা পার্কে ঢুকে পড়েছে জগদীশ, আর পার্কের বেঞ্চে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। এই তো বাড়ী থেকে চলে এলো! আচ্ছা এরপর? বেশ, নাহয় এরপর ঘুরতে ঘুরতে আরো একটু পরে হাওড়া কি শেয়ালদা, যে কোনো এক স্টেশন থেকে যে কোনো একটা জায়গার টিকিট কিনে চড়েই বসলো ট্রেনে! কিন্তু তারপর? সকাল হতেই তো মুখ ধোওয়া, স্নান করা, জামা বদলানো ইত্যাদি নানা ঝঞ্ঝাট। তারপর রাত্রে?

ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, খিদে পায়—ঘুম পায়—বুকের ভেতর কেমন করে! নাঃ, নিরুদ্দেশের এটা ঠিক পদ্ধতি নয়। অন্ততঃ কিছু জামা-কাপড়, আর আর্শী চিরুণী, টুথপেষ্ট টুথব্রাশ, বালিশ-বিছানা এটা সেটা সঙ্গে না নিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ায় অনেক অসুবিধে। তা'হলে? তা'হলে এখন ফেরা!

ফেরা তো! কিন্তু কোথায় ফেরা! সেই বাড়ীতে; যেখানে এক-গণ্ডা খাঁড়া শানানো রয়েছে জগদীশের জন্যে?.....মেজদার সেই শালা-শালীরাও আছে না?

কি খেলো তারা? ডিমের ডালনা, আর রাবড়ী দিয়ে লুচি? কে জোগাড় করলো সে সব?

ওরে বাবারে! কেটে ফেললেও সে-বাড়ীতে ফিরতে পারবে না জগদীশ।

# গল্প ভালো আবার বলো

সকাল হোক, যা থাকে কপালে। বেঞ্চের ওপরেই শুয়ে পড়লো জগদীশ; আর আশ্চর্য্য, ঘুমিয়েও পড়লো।

ঘুম ভাঙলো প্রায় শেষরাত্রে।

প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে থেকেই 'চড়াৎ' করে মনে পড়ে গেলো সব। সঙ্গে সঙ্গে বুকপকেটে হাত। কিন্তু হায়, বুকপকেট থেকে বুক পর্য্যন্ত সব ফাঁকা।

নোট নেই!

এ পকেটে, ও পকেটে, কোঁচার ভাঁজে, বেঞ্চের নীচে, কোথাও নেই।

আর কিছু নয়, পার্কের মালীর হাত-সাফাই। বোধহয় গেট্ বন্ধ করার আগে ঠেলে তুলে দিতে এসেছিলো ওকে, অতঃপর আর ঘুমভাঙানো সুবিধের মনে করেনি।

পাগলের মতো সারা পার্কের ঘাস হাতড়ে বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি সকাল হয়ে গেলো। কতো কি পড়ে আছে পার্কে চকোলেটের রাঙতা, সিগারেটের কাগজ, আলু-কাবলির শালপাতা, ছোটছেলের মোজা এক পাটি, নেই শুধু হারানো মাণিক।

আবার বেঞ্চে বসে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললো জগদীশ।

কিছু নয়, একটি রোমাঞ্চকর গল্প বানাতে হবে, নচেৎ আজ উদ্ধার নেই। জীবনে এতো গল্প পড়লো, আর একটা গল্প বানাতে পারবে না?

পার্কে জল দিচ্ছে, বেশ কাদা কাদা ঘাস।

দু'হাতে খানিক কাদা নিয়ে জামার এখানে ওখানে লাগিয়ে সেই হাতে চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে চড়ে বসলো একটা রিকশায়, বলে দিলো নিজের বাড়ীর রাস্তা।

তারপর?

তারপর বাড়ী।

● নিরুদ্দেশ যাত্রা

# গল্প ভালো আবার বলো

কিন্তু এ কি! বাড়ীর সামনে লোক কেন এতো? দাদারা, দাদাদের শালারা, পাড়াপড়শীরা, জগদীশের পিসেমশাই পর্য্যন্ত! কেন? কেন? এরা সকলেই কি লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে জগদীশের জন্যে?

তা'হলে!

ভগবান্ এখন উপায়!

কিন্তু কই? লাঠি কই? বরং রিকশা থামার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মধ্যে এক বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাস "এসেছে! এসেছে! এসেছে!"

"কি হয়েছিলো? কোথায় ছিলি? সারারাত যে আমরা থানা আর হাসপাতাল করে বেড়িয়েছি"..."থাক থাক এখন ওকে কিছু প্রশ্ন করো না, আগে সুস্থ হতে দাও?"

তাকিয়ে দেখতে সাহস হয়না, চোখ

জগদীশ চড়ে বসলো একটা রিকশায়

[ পৃঃ—৪৯

# গল্প ভালো আবার বলো

বুজে টলতে টলতে 'অসুস্থ' জগদীশ বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে—"ধপাস্!"

ভিতর থেকে ছুটে আসেন বৌদিরা, বৌদির বৌদি, আর গুণের গোপাল ভাইপো-ভাইঝিরা।

"কি হয়েছিলো!"

জগদীশ জড়িত অস্ফুটস্বরে বলে, "গুণ্ডা!"

"গুণ্ডা?"

"হ্যাঁ, দুটো গুণ্ডা!"

"কোথায়? কোথায়?"

"খাবারের দোকানের ওই মোড়ের কাছে—" তেমনি অস্ফুটস্বর জগদীশের—"ফস্ করে পকেট থেকে নোট দু'খানা টেনে নিয়ে ছুট্! আমিও তাদের পেছন পেছন—"

"কী সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ বড়দা! একটু জল দাও বৌদি! পেছন পেছন ছুটে...উঃ, কোন্ দিকে গিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি, একটা গলির মধ্যে ঢুকতেই ওরা আমাকে—" জল খেয়ে আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে গল্প শেষ করে জগদীশ, "ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর আর মনে নেই। সকালবেলা দেখি সিংহী পার্কের একটা বেঞ্চে পড়ে আছি! তোমার নোট দু'খানা যে গেলো মেজদা!"

"নোট দু'খানা?"

মেজদা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠেন, "চুলোয় যাক নোট, তুই যে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছিস এই ঢের।"

"হ্যাঁ, এই ঢের!" মন্তব্যের একটা ঢেউ ওঠে, "উঃ ভাগ্যিস ছুরি-টুরি বার করেনি ব্যাটারা।"..."ভগবান রক্ষে করেছেন! কিন্তু যা-ই বলো, অতো অসমসাহসী হওয়া তোমার ঠিক হয়নি ছোট ঠাকুরপো, দু' দু'টো গুণ্ডার পেছনে—উঃ।"..."তা'

# গল্পে ভালো আবার বলো

সত্যি প্রাণ আগে, না টাকা আগে? তোমাদেরও উচিত হয়নি বাপু রাত দশটায় বাচ্চা ছেলের হাতে অতোগুলো টাকা দিয়ে রাস্তায় বেরোতে দেওয়া।"

"হ্যাঁ অন্যায় হয়েছিলো সত্যি, তাড়াতাড়ির সময়, ইয়ে—অতো আর,—যাক, প্রাণটা নিয়ে যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে, এই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ!"..."বড়দি তুমিও চলো—আমাদের সঙ্গে কালীঘাটে, ওখানেই মায়ের পুজো আর হরির লুঠ না কি দেবে বলছিলে—"

"তাই চলো ভাই, পাঁচসিকের হরির লুঠ, আর মায়ের কাছে ষোলো আনার পুজো—"

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে জগদীশ! এসব তার জন্যে? এদের কাছে এতো দাম জগদীশের?

এতোদিনের সমস্ত ধারণা কেমন গোলমাল হয়ে যায় বেচারার।

না, নিরুদ্দেশ হওয়া আর হয়ে ওঠেনি জগদীশের! জগদীশকে যারা এতো ভালোবাসে, তাদের ছেড়ে জগদীশ যাবে কোথায়? বরং অহরহ মনের মধ্যে সেই কুড়ি টাকার কাঁটাটা খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে।...সত্যিকথাটা একদিন বলে ফেলতে না পারলে আর শান্তি নেই।

# কেমন ওষুধ!

এ বাড়ীর এতো জিনিস থাকতে চুরি গেলো কি না মেজমামার ফাউণ্টেন পেন! যে মেজমামা মাত্র কাল সকালে এ বাড়ীতে পা দিয়েছেন, আর যে পেনটি তিনি না কি মাত্র এক সপ্তাহ আগে কিনেছেন।

মেজমামা, মানে আর কি, ঝণ্টু কাণ্ঠুদের মেজমামা। ফাউণ্টেন পেন হারানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে ঝণ্টুদের মাকে ডেকে সনিশ্বাসে বললেন—দেখ্ পুঁটি, তোর বাড়ীতে গোটা সাতেক দিন থাকবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু যা দেখছি ফেরার সময় বোধহয় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরতে হবে!

পুঁটি সখেদে বললো—সে কি মেজদা, সে কি?

—কি আর, এই তো পড়েই আছে সোজা হিসেব! মাত্র সাতটাই জিনিস আমার —যথা, ফাউণ্টেন, চশমা, ঘড়ি, সোনার বোতাম, জুতো, ছাতা, সুটকেস। তা'—দৈনিক যদি একটা করে হারাতে থাকে, তা'হলেই যাবার সময় দু'হাত ফর্সা!

# গল্প ভালো আবার বলো

পুঁটি কাতর হয়ে বলে—দৈবাৎ একটা হারিয়েছে বলে অতো কিছু ভেবোনা মেজদা! কই আমাদের তো কক্‌খনো কিছু হারায় না!

—হারায় না—বলেই তো আরো ভাবনার কথা! তোমাদের হারায় না, আমার হারালো—তার মানে, জানা চোর। উঃ কলমটার কথা মনে পড়লেই মনটা হু হু করে উঠছে! নগদ পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে কেনা!

পুঁটি বেচারা আর কি করে, মেজদার পঁয়তাল্লিশ টাকার পেনের শোক নিবারণ করতে মাংসের চপ্‌ ভাজতে বসে।

ঝণ্টুর বাবা কান্তিবাবু কিন্তু ব্যাপারটা শুনেও তেমন গায়ে মাখলেন না। বললেন—চুরি মানে? চুরি অমনি গেলেই হলো? বাড়ীর কোনো জিনিস চুরি যায় না, আর তোমার দাদার জিনিসটিই চুরি যাবে?...আছে কোথাও, খুঁজে দেখো ভালো করে।—ছেলেগুলোকে লাগিয়ে দাও খুঁজতে।

পুঁটি বললে—সে কি তুমি বলবে, তবে হবে? কতো খুঁজেছে ওরা জানো কিছু?

কান্তিবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—জানি কিছু কিছু। ওদের খোঁজা মানে খানিকক্ষণ এঘর ওঘর বেড়িয়ে নিয়ে বলা—"কোথাও পেলাম না।" এই তো? আচ্ছা রোসো, আমি একটা ওষুধ ঝাড়ছি।

অতঃপর কান্তিবাবু বাড়ীর সব ছেলে ক'টিকে জড়ো করলেন। ঝণ্টু কাণ্ঠু, তা'দের জেঠতুতো দাদা ঘণ্টু পিণ্টু, আর খুড়তুতো বোন মিষ্টি আর বৃষ্টি! সবাইকে ডেকে গম্ভীর ভাবে বললেন—দেখো, তোমাদের মেজমামার কলমটা হারিয়ে গেছে শুনছি। এটা খুবই দুঃখের কথা! শুধু দুঃখের নয়, লজ্জার কথাও। কারণ তিনি এ বাড়ীর অতিথি। নিজেদের জিনিস হারানোর চাইতে অনেক পরিতাপের বিষয়, অতিথির জিনিস হারানো! তবে—আমার ধারণা—বাড়ীতেই কোথাও আছে। এখন

● কেমন ওষুধ!

# গল্প ভালো আবার বলো

কথা হচ্ছে একটু কষ্ট করে খুঁজতে হবে। যে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকে নগদ আট আনা প্রাইজ!

আট আনা!!

প্রায় অর্দ্ধেক রাজত্ব!

—আচ্ছা বেশ বাপু, পুরোপুরি ষোলো আনাই নিস।

তবু—ঝণ্টু গম্ভীর ভাবে বলে—আট আনা?... মেজমামা বলছিলেন কলমটার দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা।

—আচ্ছা বেশ বাপু, পুরোপুরি ষোলো আনাই নিস। কিন্তু তাড়াতাড়ি চাই!

পুরোপুরি ষোলো আনা!

ঝণ্টুদের কাছে যা—পুরো একটা রাজত্বের সামিল।

লেগে গেলো খোঁজার ধুম ধড়াক্কা।

সে কী ধুম!

ইঁদুরের গর্ত্ত থেকে সুরু করে আলমারির মাথা পর্য্যন্ত খোঁজা চলতে থাকে। ...পিণ্টু অনেক ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প পড়ে, সে বললো—

● কেমন ওষুধ!

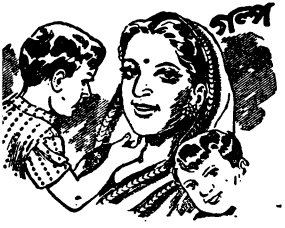

# গল্প ভালো আবার বলো

বালিশের তুলো ছিঁড়ে ভেতরগুলো দেখবো রে বৃষ্টি?

বৃষ্টি ভয়ে ভয়ে বললে—না রে মেজদা, জেঠীমা তা হ'লে রেগে কুরুক্ষেত্তর করবেন।

কথাটা ঠিক! কুরুক্ষেত্রকাণ্ড দেখবার সৌভাগ্য যার হয়নি, অথচ দেখবার সাধ যার আছে, সে ইচ্ছে করলে পিণ্টুদের জেঠীমার রাগ দেখে আসতে পারো।

সেটা আর হলো না, তবে লেপ তোশক বালিশ বিছানা লণ্ডভণ্ড হলো! বাড়ীর মহিলারা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে লাগলেন!

আর বলবো কি আশ্চর্য্য কথা, কলমটা শেষ পর্য্যন্ত সত্যি পাওয়াই গেলো!

'পাওয়া গেছে?' 'পাওয়া গেছে?' 'কোথায় ছিলো?' 'কোথায় পেলি?' রব উঠলো বাড়ীতে।

সত্যি কোথায় পাওয়া গেলো?

আর কোথাও নয়, মেজমামা যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরের খাটের তলায়। খাটের তলা মানে জঞ্জালের আড়তে। বাঙালীর বাড়ীতে তো আর খাটের তলা ফাঁকা থাকে না, বাড়ীর যত জঞ্জাল লুকোনো থাকে খাটের তলায়। সেখানে কেমন করে গড়িয়ে গিয়েছিলো কে জানে!

মেজমামা কলমটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—আহা বাছারে, ধুলোয় পড়ে থেকে রোগা হয়ে গেছে, একটু খেতে দিই। বলে কালি ভরতে সুরু করলেন।

পুঁটি হরির লুট পাঠালো!

কান্তিবাবু এসে আত্ম-প্রসাদের হাসি হেসে বললেন—দেখলে তো? কেমন ওষুধ বাৎলেছি! লোভটি না দেখালে ব্যাটারা খুঁজতো? ছেলেপুলের ওষুধই হলো—লোভ দেখানো, বুঝলে? তা' নয়, তোমরা মারবে ধরবে ধমক দেবে। ওতে কি আর কাজ পাওয়া যায়?

● কেমন ওষুধ!

# গল্প ভালো আবার বলো

কথাটা সত্যি!

স্বীকার করলো সবাই! 'ছেলে ভুলোনো' বলে কথাটার সৃষ্টি হয়েছিলো কেন তা' না হলে? ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে সব করিয়ে নেওয়া যায় ওদের দিয়ে।

যাক, বাড়ীতে আনন্দ পড়ে গেলো। কুটুম্ব মানুষের জিনিস হারিয়েছিলো, কম লজ্জার কথা!

কিন্তু এ কী!

এ যে হরিষে বিষাদ!

পর দিন দেখা গেলো মেজমামার ঘড়ি নেই! এ কী সর্ব্বনেশে কাণ্ড!

মেজমামা চীৎকার করে বলে উঠলেন—ভূতের বাড়ী! ভূতের বাড়ী! রাতে টেবিলে ঘড়ি রেখে শুয়েছি, সকালে উঠে হাওয়া? ...অথচ ঘরে খিলবন্ধ ছিলো। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যই

লেপ তোশক বালিশ বিছানা লণ্ডভণ্ড হলো! [পৃঃ—৫৬

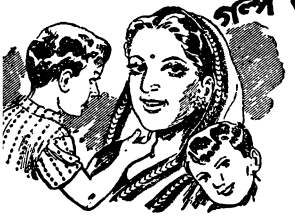

# গল্প ভালো আবার বলো

বা বলছি কেন? গোড়াতেই জানি, সাতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরতে হবে আমায়!

কিন্তু সত্যি গেলো কোথায়? রিষ্টওয়াচ কিছু আর কলমের মতো গড়িয়ে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকবে না!

পুঁটি কেঁদে ঠাকুরঘরে গিয়ে বললো—হে হরি! এবার আর স'পাঁচ আনা নয়, পুরো পাঁচসিকে!

কান্তিবাবু হাঁকলেন—আজ আর ষোলো আনা নয়, বত্রিশ আনা!

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ!

আজকের ধুম ধড়াক্কা আরো জোরালো! সারাবাড়ী তন্ন তন্ন!...শেষ পর্য্যন্ত কাণ্ঠু পেলো খুঁজে! ছিলো নাকি সেলফের বইয়ের পিছনে!

পুঁটি বললে—অবাক কাণ্ড! ঘড়িটা কি হাঁটতে পারে?

কান্তিবাবু বললেন—মোটেই তা নয়। তোমার দাদারই কীর্ত্তি! বোধহয় হারিয়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে রেখে ভুলে গিয়েছিলেন।

মেজমামা অবশ্য মানতে চাইলেন না সেকথা, ঢের তর্ক করলেন তবু ঘড়ি পেয়ে বাঁচলেন।

কাণ্ঠুর নগদ দু টাকা লাভ।

রাজত্ব নয়—পুরোপুরি সাম্রাজ্য!

বাড়ীর আর সব ছেলেরা কাণ্ঠুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো, তাকে সাধু ভাষায় বলে ঈর্ষা!

অবিশ্যি পাঁচসিকের হরির লুটের বাতাসার ভাগটা সবাই সমান পেলে তাই রক্ষা!

তারপর?

● কেমন ওষুধ!

# গল্প ভালো আবার বলো

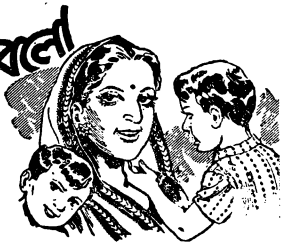

তারপর দিন আবার বাড়ীতে এক অভাবনীয় কাণ্ড! সে শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না!

আজ আর শুধু মেজমামা নয়, ঘুম থেকে উঠে সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—'কোথায় গেলো!'

বাড়ীর আর সব ছেলেরা কাণ্ঠুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো... [পৃঃ—৫৮

কাণ্ঠুদের বাবা, কাকা, জেঠামশাই, মেজমামা, মা, কাকীমা, জেঠীমা মুহুর্মুহুঃ ডুকরে উঠছেন—'কোথায় গেলো?'

'আমাদের চশমা কোথায় গেলো?'... 'আমার জুতো কোথায় গেলো?'...'আমার কাপড় কোথায় গেলো?'... 'আমার কানের দুল খুলে রেখেছিলাম রাতে, কোথায় গেলো?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনকি পুঁটির ঠাকুর ঘরের ঠাকুরের রুপোর গেলাস লোপাট!

সে বেচারা আজ মবলগ পাঁচটাকার পুজো মেনে বসে। আর কান্তিবাবু সব দেখে শুনে গম্ভীর ভাবে বলেন—হুঁ, যা দেখছি দক্ষিণে

● কেমন ওষুধ!

# গল্প ভালো আবার বলো

আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। আজ নগদ পাঁচ! যে যা পাবে দক্ষিণা পাঁচ!

ব্যস এ কথায় মন্ত্রবলের মতো কাজ হলো!

ঝড়াঝড় হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া যেতে লাগলো। সমস্ত জিনিস না কি একতলায় নেমে পড়ে কয়লার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে!

কি করে ঢুকেছে?

সেই তো রহস্য!

মেজমামার কথাই হয়তো সত্যি! ভূত আশ্রয় করেছে বাড়ীতে।

'টাকা কই টাকা?' 'পাঁচ-টাকা?'...'আমি খুঁজেছি আমি!'

সমবেত কণ্ঠে ঐকতান-বাদন সুরু হয়েছে—'আমি পেয়েছি — আমি!'...'আমি ঘড়ি!'...'আমি চশমা'... 'আমি দুল'...'আমি জুতো—'

কান্তিবাবু বলেন—

গুণে গুণে পাঁচটি করে গাঁট্টা দিলেন মাথা পিছু! [ পৃঃ—৬১

# গল্প ভালো আবার বলো

আলাদা আলাদা দেবো কেন? লাইন দিয়ে দাঁড়াও এক-সঙ্গে—পর পর দিয়ে যাবো!

সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

উৎফুল্ল মুখ, আশাকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই, আর কান্তিবাবু প্রাইজ বিতরণ কর্‌তে লেগে যান।

মাথা পিছু পাঁচ!

কি বলছো? পাঁচটাকা?

কান্তিবাবু তো পাগল নন?...গুণে গুণে পাঁচটি করে গাঁট্টা দিলেন মাথা পিছু!

নগদ দক্ষিণা!

তার পরদিন?

নাঃ তার পরদিন থেকে আর কিছু হারালো না!

কান্তিবাবু বললেন—হুঁ বাব্বা, দেখলে তো কেমন ওষুধ বাৎলেছি! ব্যাটাদের আসল ওষুধই হচ্ছে গাঁট্টা!

তা' তো নয়, তোমরা খালি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে চাইবে। হুঁঃ! ছেলেপিলে আর কাঁকড়া বিছে, দুটি হচ্ছে একজাত! বুঝলে?

# কুচকাটা

ভালো ইস্ত্রী-করা নতুন সিল্কের পাঞ্জাবীটা সন্তর্পণে মাথায় গলিয়ে আয়নাদার আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়েই রাসুদার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেলো!

এ কী! পাঞ্জাবী না সেমিজ? হাঁটু ছাড়িয়ে পায়ের ডিম পর্য্যন্ত ঝুল্ নেমে গেছে!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন রাসুদা। হতভাগা দরজী ব্যাটার সঙ্গে কি পূর্ব্বজন্মের কোন শত্রুতা-সম্বন্ধ ছিলো তাঁর? সাড়ে তিনগজ কাপড়ের সবটাই যখন ব্যাটা নিয়ে নিয়েছিল তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিলো রাসুদার। কিন্তু সে বোঝালো, "আজকাল ওই রকমই হয়েছে! চুড়িদার হাতায় ঝুল্ যতো লম্বা হবে ততোই ভালো। সেই ফ্যাসান!"

# গল্পে ভালো আবার বলো

রাসুদার মনের কোণে একটু অবিশ্বাস উঁকি মেরেছিলো। যতোই হোক দরজী, খানিকটা কাপড় কি আর না মারবে! ভেবেছিলেন—মরুকগে, নেয় নিক খানিকটা। জিনিসটা তো ভালো হবে। রাসুদার ভাষায় 'ছচল বচল' করে হবে।

তা' ছাড়া সত্যি বলতে—'আজকাল' কেন, বহুকালের মধ্যেই সিল্কের পাঞ্জাবী রাসুদা করাননি! সেই পৈতের সময় দিদিমার দেওয়া টাকায় সিল্কের পাঞ্জাবী হয়েছিল। তারপর আর কই? সে আজ একুশ বছরের কথা!

উঁহু, অবিশ্বাসের কিছু নেই।

মাঝখানে যে, 'স্বদেশী' হয়ে গিয়েছিলেন রাসুদা! বিলাসিতা বর্জ্জন-টর্জ্জন সে সব অনেক কিছু!...কিন্তু এখন তো আর তা নয়। এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক তিনি, ভালো খাবেন, ভালো পরবেন, এই উচিত।...তাই রাসুদা ইদানীং 'বঙ্গলক্ষ্মী' মিলের বদলে কাঁচি ধুতি ধরেছেন।...এখন বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে এই সিল্কের পাঞ্জাবী।

বড়লোকের বাড়ী বিয়ে, সভ্যতার ভব্যতার দরকারও। কিন্তু এখন কি উপায়? আজই বিয়ে! সন্ধ্যা ছটায় বরানুগমন!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন না রাসুদা?

এ অবস্থায় কে না পড়তো?

দরজী-বাড়ী থেকে উদ্ধার করে জামাটাকে একেবারে লণ্ড্রীতে নিয়ে গিয়ে ইস্ত্রী করিয়ে তবে বাড়ী ঢুকেছেন। ওদিকে অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। এদিকে এই সেমিজ! মাঝে মাঝে আবার খাবার-ঘর থেকে ডাকাডাকি হচ্ছে—'ভাতে মাছি বসছে', 'বাড়া ভাত শুকিয়ে যাচ্ছে', 'রাসুর আজ অফিস নেই নাকি?' ইত্যাদি।

অধৈর্য্য হয়ে বড়দি এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—কিরে, আজ তোর অফিস নেই? বলতে হয় আগে। ভাত বাড়া হয়ে গেলো—

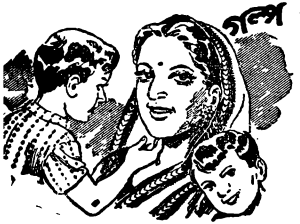

# গল্প ভালো আবার বলো

রাসুদা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন—অফিস নেই? বলো কি বড়দি? মোক্ষম রকম আছে। কিন্তু হাত-পা উঠছে না।

—ওমা সে কি! শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি? তাই তো, চোখটা ছলছল করছে যে!

তা'হলে একটু আদামরিচ দিয়ে চা খেয়ে শুয়ে পড়!

—না বড়দি। শরীর খারাপ নয়। মন! মন খারাপ!

বড়দি উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন—ওমা! কেন গো! অফিসের বড়োবাবুর ভালো-মন্দ কিছু হয়েছে না কি?

—ওসব কিছু নয় বড়দি, এই দেখো—

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা রাসুদা, দুই হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—এই দেখো।

রাসুদা বললেন—এই দেখো

পাঞ্জাবীর ঝুলটা কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছেন !

# গল্প ভালো আবার বলো

বড়দি মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে নেন এবং আশ্বাসের ভঙ্গীতে বলেন—ও! পাঞ্জাবীটার ঝুল্ বড়ো করে ফেলেছে, তাই? তা ভাবিসনে, আমি ঠিক করে রেখে দেবো। আজই তোর নেমন্তন্ন না? আচ্ছা সন্ধ্যের আগেই করে রাখবো।

—রাখবে বড়দি? পারবে?

রাসুদা যেন অকূল সাগরে কূল পান।

—ও মা, এটুকু আর পারবো না? দিন-রাত্তির সেলাই করছি! নে চল্ চল্, খেতে চল্।

আস্তে আস্তে জামাটি খুলে বিছানার ওপর পাতিয়ে রেখে খেতে যান রাসুদা।

বড়দি বললেন—কতোটা ছোট করতে হবে?

—অন্তত ইঞ্চি ছয়েক। হ্যাঁ, ছ ইঞ্চি নিশ্চয়ই।...তা'হলে বড়দি ভুলে যাবে না? তিন সত্যি?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ! পাগল আর কাকে বলে?

বড়দি নিজের কাজে চলে যান।

কিন্তু—পাগল কি ছিলেন রাসুদা? সুরেন দরজী যে তাঁকে পাগল করালো! ব্যাটাকে হাতের কাছে একবার পেলে হতো! কিন্তু সময় বড়োই শর্ট! যা যা পরে গেলেও বিপদ! বন্ধুটি হচ্ছে ভারী 'ইয়ে'!...হয়তো দেখেই বলবে—কি রাসু, জামাটা নতুন করালে বুঝি? বেড়ে করেছে তো? তোমার দরজীর ঠিকানাটা আমায় দেবে? নোট্‌বুকে টুকে রাখি!

না না, এ চলবে না।

কেটে ছোট করতেই হবে।

অন্যমনস্কের মতো ডালে ঝোলে অম্বলে এক করে খেতে খেতে রাসুদা ভাবেন,

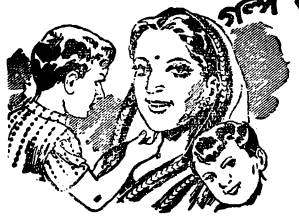

# গল্প ভালো আবার বলো

বড়দি স্নেহবশতঃ বলেছেন বটে, কিন্তু তেমন ভালো পারবেন কি?...সমস্ত দিনরাত যা সেলাই করেন তিনি, সে তো তাঁর বুড়োবয়সের খোকার কাঁথা! তার চাইতে বরং বৌদি করে দিলে কাজটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতো। কিন্তু বলবে কি, যে কুড়ে তিনি, হয়তো ওইটুকু করতে পাঁচ দিন লাগবে তাঁর!

আলাভুলোর মতো উঠে পড়লেন রাসুদা, দইয়ের বাটিতে হাত না দিয়েই।—

অফিসে গিয়ে আজ আর কিছু কাজ হলো না। জনে জনে ডেকে ডেকে, বসিয়ে বসিয়ে, পাঞ্জাবী-সংক্রান্ত এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা বললেন। দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেলো—আটাশ টাকার কাপড় আর ছ'টাকা সেলাই। সকলেই আহা উহু করলো।

সেইটুকুই সান্ত্বনা রাসুদার; কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকলেই মজা পেলো তা' কি আর বুঝলেন তিনি?

বিকেলবেলা একটু সকাল করে বাড়ী ফিরলেন রাসুদা। জামাটা—যদি সম্ভব হয় আর একবার ইস্ত্রী করিয়ে আনবেন!...

বাড়ী ফিরে আর জুতো খুললেন না, সোজা ঢুকে গেলেন ভেতর দালানে। আর সেখানে গিয়ে? কি দেখলেন সেখানে গিয়ে?

দেখলেন, দালানে কুটনোর ঝুড়ির কাছে বসে বড়দি তরকারি-কোটা বঁটি দিয়ে পাঞ্জাবীর ঝুল্‌টা কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছেন!

তাঁর মুখে রাগ, বিরক্তি এবং ক্ষিপ্রকারিতার ভাব।

—বড়দি!

তীক্ষ্ণ একটি আর্ত্তনাদ করে উঠলেন রাসুদা!—বড়দি ওকি হচ্ছে?

—এসে পড়লি তো!—বড়দি কেটে বাদ দেওয়া সিল্কের ফালি কাপড় দু'টুক্‌রো মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলেন—রোজ রাত আটটায় বাড়ী ফিরিস,

# গল্প ভালো আবার বলো

আর আজই অমনি সাড়ে পাঁচটায় এসে হাজির! হাত গুনিস নাকি?

—কিন্তু বড়দি? কী এ? কী কাণ্ড এ? তু-তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?

—পাগল হবো না? বলিস কি? সারা বাড়ী তচ্ নচ্ করে একখানা কাঁচি পেলাম না! এদিকে তোর কাছে বাক্যদত্ত হয়ে রয়েছি। রাগ করে বঁটি দিয়ে দিলাম কুপিয়ে!... বোস্ তুই, এই যাচ্চি চট করে, তলাটা মুড়ি সেলাই করে আনি।

রাগে দুঃখে অভিমানে রাসুদার চোখে প্রায় জল এসে পড়ে! বড়দি-কে আর কিছু না বলে সোজা চলে গেলেন বৌদির কাছে। গিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে বল্লেন—বৌদি, সারাদিনই তো নভেল পড়ে কাটাও।

সিল্কের ফালি বার করে রাসুদার নাকের সামনে দুলিয়ে দিলেন। [ পৃঃ—৬৮

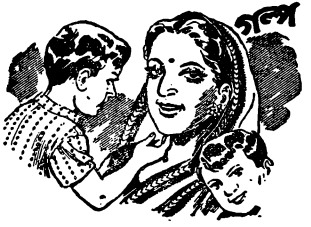

# গল্প ভালো আবার বলো

সামান্য একটা কাজ; অতো করে বলে গেলাম, তা পারলে না?

বৌদি চোখ ভুরু কুঁচকে বলেন—কেন, কি করা হয়নি? তাই সারাদিন নভেল পড়ার খোঁটা দিচ্ছো?

—আমার পা—পান্ পাঞ্জাবী?

বৌদি বলেন—যথাসময় করে রাখা হয়েছে মশাই, বিশ্বাস না হয় তো এই দেখো। বলেই বৌদি বিছানার তলা থেকে জামার ঝুল্ কমানো সেই ছয় ইঞ্চি চওড়া দুটো সিল্কের ফালি বার করে রাসুদার নাকের সামনে দুলিয়ে দিলেন।

—তু—তুমি ক—করেছো?

—দেখলেই তো প্রমাণ। তা তোৎলা হয়ে যাচ্ছো কেন ঠাকুরপো? বরযাত্রী যাবে তুমি, আর জামাটা অভব্যি হয়ে থাকবে তাই কখনো দেখতে পারি? অবিশ্যি আলিস্যি করে একবার বলেছিলাম তোমার ভাইঝিকে।...তা' দেখি মেয়ে গল্পের বই নিয়েই মত্ত। ভাবলাম, মরুকগে আমিই—

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে দাদার মেয়ে অরুণার গলা শোনা গেলো—মা, আমার নাম শুনতে পাচ্ছি কেন? নিশ্চয় ছোটকাকার কাছে নিন্দে করছো?

বৌদি বলেন—কেন, আমি কি তোর নামে শুধু নিন্দেই করি?

—তা ছাড়া আবার কি? দফায় দফায় সকলের কাছেই করো। ঠাকুরমার কাছে বলো 'ধিঙ্গি', বাবার কাছে বলো 'ফাঁকিবাজ', পিসিমার কাছে বলো 'অবাধ্য', আর ছোটকাকার কাছে তো কথাই নেই! যা খুসি বলো।...এখন কি বলছিলেন গো ছোটকাকা?

রাসুদা কিছু বলার আগে বৌদি মেয়ের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে বলেন—বানিয়ে বানিয়ে কিছুই বলিনি! ছোটকাকার নতুন সিল্কের পাঞ্জাবীর ঝুল্‌টা খাটো করে দেবার কথা বলিনি তোকে?...দিয়েছিলি? সারাদিন গল্পের বইয়ে নাক ডুবিয়ে থাকবি—

# গল্প ভালো আবার বলো

অরুণা বড়ো বড়ো চোখ করে বলে—দিইনি মানে? মেপে মেপে ছটি ইঞ্চি বাদ দিয়েছি না? মিছি মিছি আমার নামে দোষ দেওয়া চাই! না কি তবুও বড়ো লাগছে? অমন সুন্দর করে তলাটা সেলাই করলাম ঠিক দরজীর মতন! ওকি, কি হলো তোমার ছোটকা?...

ও কি, কি হলো তোমার ছোটকা?

অমন বসে পড়লে কেন? মাথা ঘুরছে? ...মা তুমিও যে—

বৌদিও বসে পড়েছেন বিছানার ওপর। বসে পড়ে আর্ত্তনাদ করে বললেন — ঠাকুরপো! কি হবে? হায় হায় আমি কি করলাম!

উত্তরে রাসুদা হাহাকার করে বলে ওঠেন—তুমিই বা কতো করেছো? আরো দেখতে চাও তো বড়দির ঘরে গিয়ে দেখো গে। এরপরও তাকে বঁটিকাটা করে গুণছুঁচ্ বিঁধোনো হচ্ছে।...ওরে অরুণা, তোরা সবাই মিলে, আমাকে কচুকাটা করলি না কেন? কেন কেটে কেটে নুনের ছিটে দিলি না? সে বরং এর চেয়ে ভালো ছিলো!

সব মানুষই কিছু সৌখিন নয়, কিন্তু কিছু না কিছু সখ প্রত্যেকেরই থাকে। কারো বা ভ্রমণের সখ, কারো বা শিকারের। কারো বা খাওয়ার সখ আছে, কারো বা খাওয়ানোর। বাংলাদেশে তো শতকরা বাষট্টি জনের লেখক হবার সখ আছে, তেত্রিশ জনের সখ পত্রিকা প্রকাশের। এমনি নানা সখ থাকে প্রত্যেকের মধ্যেই। অবিশ্যি সার্ব্বজনীন সখও থাকে এক আধটা—ধরো যেমন সিনেমা দেখার সখ। এ সব শতকরা একশো বারো জনের আছে, এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের হিসেব। বিশ্বাস না হয় শহরের জনসংখ্যা এবং সিনেমার টিকিট বিক্রির সংখ্যা মিলিয়ে দেখো।

কেন, তোমাদের বাড়ীর হিসেবই নাও না? ও সখটা নেই কার? ঠাকুমা থেকে ছোট খোকা?...বুড়ো ঝি থেকে ছোকরা বামুনঠাকুর পর্য্যন্ত। সিনেমার নামে কে না পাগল?

তা' এ সব হলো সখ।

আর সখের একটি মাসতুতো ভাই আছে, তার নাম হলো গিয়ে সাধ। যেমন

# গল্প ভালো আবার বলো

আমাদের হাঁদুর আজীবনের সাধ জাহাজের কাপ্তেন হবার।...আর বক্কেশ্বরের ছোটকাকার চিরকালের সাধ এরোপ্লেনের পাইলট হবার!...জজ হবার সাধ তো আক্‌ছার লোকেরই আছে।...আমারই তো—মানে আমিই তো ডায়েরীর পাতায় লিষ্ট করে রেখেছি—দৈবাদেশে হঠাৎ কোনদিন যদি চীফ জজের পোষ্টটা পাই, সঙ্গে সঙ্গে কা'কে কা'কে ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম দেবো।

আমাদের ঘটাইদা'র কিন্তু এতো বড়ো বড়ো আর এমন রোমাঞ্চকর সাধ কোনো কালেই নেই। আছে ছোট্ট একটি সাধ। ঘটাইদা যখন ম্যাট্রিক পড়তো আর আমি ফোর্থ ক্লাশে (সেকালে ওই রকমই বলা হতো) তখন থেকেই ঘটাইদা এই সাধটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করতো।...সেই কাল থেকেই ঘটাইদা'র একটু 'ধুম দোষের' অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছিলো। ও যখন মুখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে বিশ্বের দিকে কেমন একটা হাস্যভরা দৃষ্টি হেনে বলতো—"জীবনে এইটি হচ্ছে আমার এক-মাত্র সাধ বুঝলি? ওন্‌লি ওয়ান। একটি বড়ো চাকরি;—আর হঠাৎ একদিন বড়ো সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে মুখের ওপর চোটপাট করে ঘ্যাচ্‌ করে—চাকরিটি ছেড়ে দেওয়া! ব্যস!"...তখন আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম!

কী অদ্ভুত আর মৌলিক সাধ! আর সত্যি সাধের মতো সাধ!

একদিন অবশ্য আমি একটা বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম, আর হাস্যাস্পদও হয়েছিলাম। বলেছিলাম—আচ্ছা ঘটাইদা, বড়ো সাহেব যদি খুব ভালো হয়? কী করে ঝগড়া বাধবে তা'হলে?

হৈ হৈ করে হেসে উঠেছিলেন ঘটাইদা। হেসে হেসে আর দুলে দুলে কিছুক্ষণ আমাকে অপ্রতিভ করে রেখে, অতঃপর কাঁচি মার্কায় একটি সুখটান দিয়ে বলেছিলেন

● ঘ্যাচ্‌ করে

# গল্প ভালো আবার বলো

—ঝগড়া বাধাবার জন্যে আবার কারণ খুঁজতে হয় নাকি খুব জানা আছে। ওর জন্যে ভাবি না।...আর কবে যে রে? ও তো স্বেচ্ছাধীন! ঝগড়া বাধাবার ট্রিকস আমার এই ছাত্তরগিরি ছেড়ে চাকরিতে ঢুকবো!

আমি আবারও বলে ফেলেছিলাম—চাকরি ছাড়াটায় কি এমন সুখ হবে?

—সুখ?...ঘটাইদা নিমীলিত নেত্রে বলেন—বুঝবি নারে, বুঝবি না!... ও সবাই বোঝে না। নইলে দেখছি তো দোহাত্তা লোককে! জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে একই অফিসে কলম ঘষে! ছিঃ! বড়ো সাহেবের নাকের ওপর রেজিগ্‌নেশন লেটার-খানা ছুঁড়ে মেরে ঘ্যাচ্ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসার আস্বাদ যদি বুঝতো লোকে।

ভয়ে ভয়ে বলে-ছিলাম—কিন্তু তুমি তো কোনোদিন চাকরি করো নি ঘটাইদা? তুমি কি করে বুঝলে?

কাঁচি মার্কায় একটি সুখটান দিয়ে বলেছিলেন—[ পৃঃ—৭১

● ঘ্যাচ্ করে

# গল্প ভালো আবার বলো

—কি করে বুঝলাম? বলি—কবিরা কি করে 'স্বর্গ-সুখের' মহিমা বোঝে রে? কল্পনায়,—বুঝলি—কল্পনায়!

তা' এসব তো ছাত্তর জীবনের কথা।

তারপর বি, এ, পাশের পর—মানে ঘটাইদা'র বি, এ, পাশের পর—পিসেমশাই ঘটাইদা'কে তাঁর এক বন্ধুর শ্যালার অফিসে ঢুকিয়ে দিলেন।

ওঃ, বলা হয়নি বুঝি? হ্যাঁ, ঘটাইদা আমার পিসতুতো দাদা।.....চাকরি হ'বার পর ঘটাইদা প্রথম মাইনে পেয়ে ঘটা করে একদিন আমাদের বাড়ী এসে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে সিনেমা দেখালে—উপরি আবার ঠাকুরমাকে মানে ওর দিদিমাকে সিল্কের নামাবলী দিয়ে প্রণাম!...ধন্যি ধন্যি করলো সবাই ঘটাইদাকে। নজরটা বরাবরই উঁচু ঘটাইদা'র—বেশ পষ্ট মনে আছে, পরের মাসে আমাকে দু' দু'দিন হোটেলে খাইয়েছিলো, আর আমার ছোট ভাই বিল্লুকে কিনে দিয়েছিলো ক্যারামবোর্ড।

সেই সময় একদিন কথাটা পাড়লাম! ফিস্ ফিস্ করে বললাম—ঘটাইদা কবে সেটা করবে?

ঘটাইদা আশ্চর্য্য হয়ে বললো—কোন্‌টারে?

মহোৎসাহে বললাম—আঃ, সেই আসল কাজটা? বড়ো সাহেবের মুখের উপর চোটপাট করে, ঘ্যাচ্ করে চাকরিটা—

ঘটাইদা একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে—ওঃ সেই কথা বলছিস? সে তো যে কোনদিন ইচ্ছে! নিজের হাতের মুঠোয়—তবে কথা কি জানিস? পিঁপড়ে মেরে হাত নষ্ট করে লাভ কি? ভারী তো দেড়শো টাকার চাকরি, থাকলেই বা কি আর ছাড়লেই বা কি! একটা মোটা মাইনের চাকরি না হলে ঘ্যাচ্ করে ছেড়ে সুখ কি?

কথাটা অনুধাবন করি।

সত্যিই বটে! বড়ো চাকরির কথাই বরাবর বলেছে ঘটাইদা।

● ঘ্যাচ্ করে

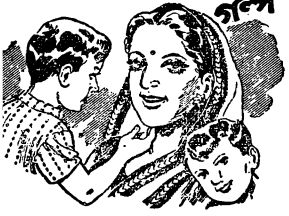

# গল্প ভালো আবার বলো

তা' এসব তো অনেক দিনের কথা। তারপর আমারও ছাত্তর জীবন শেষ হলো, এদিক ওদিক ঘুরতে লেগেছি নিজের ধান্ধায়, হঠাৎ শুনি ঘটাইদা দিব্যি বিরাট এক পোষ্ট বাগিয়েছে! পিসেমশাইয়ের বন্ধুর শ্যালা —অর্থাৎ ঘটাইদা'র বড়ো সাহেব ঘটাইদা'র উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাব্-ম্যানেজার করে নিয়েছেন। চারশো টাকা মাইনে, আরো কি সব অ্যালাওয়েন্স টেন্স!

সকলে মিলে ঘটাইদা'র ভাগ্যকে ধন্যি ধন্যি করতে লাগলো!

পিসিমা সত্যনারায়ণের শিরনি দিলেন! গেলাম আমরা। খুব হৈ হৈ, খুব স্ফূর্ত্তি সবাইয়ের! ঘটাইদা নিজে নিজেই কড়াপাকের মুণ্ডি সন্দেশের ঝোড়া হাতে নিয়ে বিলোতে লেগেছে।

বুঝলাম এতোদিনে ঘটাইদা'র চির-

—ওঃ সেই কথা বলছিস? [পৃঃ—৭৩

# গল্প ভালো আবার বলো

জীবনের সাধ মিটাবার আশা হয়েছে বলেই এমন খুশিতে উপচে পড়ছে সে।

আশায় আশায় দিন গুণি—কোন্ দিন ঘটাইদা উৎফুল্ল মুখে এসে বলে—দিয়ে এলাম! বুঝলি, ঘ্যাচ্ করে ছেড়ে দিয়ে এলাম চাকরিটা! রেজিগ্নেশান লেটারখানা ব্যাটার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে এলাম জুতো মসমসিয়ে!

না, ঘটাইদা আর আসে না।

অতঃপর নিজেই একদিন যাই। ঘটাইদা খুব সমাদর করে বসায়, বসিয়ে বলে —যেতে পারি না রে, বড্ডো কাজের চাপ—

ফস্ করে বলে ফেললাম—তাতো বুঝছি! কিন্তু আসল কাজটার কি হলো?

—আসল কাজ?—ঘটাইদা ভুরু কুঁচকে তাকালো।

সংক্ষিপ্ত করে বলি—আঃ, তোমার সেই ঘ্যাচ্ করে—

—ওঃ হো হো!—ঘটাইদা একটু মধুর হাসি হেসে বলেন—হবে, হবে! হবে কেন হয়েই আছে! ইচ্ছে করলেই যে কোনোদিন—ব্যাটা কিসে চটে, তাও জানা আছে। লাগিয়ে দিলেই হলো। তবে কি জানিস্?

—কি?

—কি জানিস্? ছোটোখাটো ক'টা ইচ্ছে আছে, সেগুলো মিটিয়ে নিয়েই—মানে টাকা ছাড়াতো কোনো ইচ্ছেই মেটবার নয়?...বাবার জন্যে একটা রুপোর গড়গড়া গড়িয়ে দেবার ইচ্ছে আছে বুঝলি? মার নাকি লক্ষ্মীর কৌটো সোনা দিয়ে গড়াবার ইচ্ছে—নিজের গোটা কয়েক, মানে বেশ গোটা কয়েক স্যুট করিয়ে নেবো ঠিক করেছি, আর জোড়াকতক জুতো। ব্যস্, তার পরেই একদিন ঘ্যাচ্ করে—

# গল্প ভালো আবার বলো

তারপরটা কিন্তু হয়ে গেলো নানা রকম।

তারপর বিয়ে হয়ে গেলো ঘটাইদা'র। খুব ঘটাপটা করে। আমি বললাম—ঘটাইদা, তোমার আজীবনের সাধ তা' হলে খতম? বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হয়ে গেলে?

ঘটাইদা একটি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—দূর! আমি ও সব স্ত্রী পুত্র পরিবারের কেয়ার করি না। দেখিস্ না, কোন দিন শুনবি পাঁচশো টাকার চাকরিটা তোদের ঘটাইদা ঘ্যাচ্ করে—ব্যস্!

আমিও এদিকে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ছি।

ঘটাইদা'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমই

ঘটাইদা একটু মধুর হাসি হেসে বলেন—[ পৃঃ—৭৫

# গল্পে ভালো আবার বলো

ঘটে। ইত্যবসরে হঠাৎ একদিন পিসেমশাই হার্টফেল করলেন।

মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম বেচারা ঘটাইদা! সবেমাত্র যেই চারদিক একটু গুছিয়ে নিয়ে, আজন্মের সাধ মেটাবার তাল খুঁজছিলো, তখনি কি না পিসেমশাই সাধে বাদ সাধলেন!

আমি আর বলিনি, ঘটাইদা নিজেই বললেন একদিন। একটা বিষাদের হাসি হেসে বললেন—সবই ঘাড়ে পড়ে গেলো! বড়ো সাহেবকে চটানো ছেড়ে, উল্টে আরো তোয়াজ করতে হবে। না! একটা লটারী ফটারীতে ফার্ষ্ট প্রাইজ না পেলে আর সাধটা মিট্‌বে না। প্রাণপণে টিকিট কিনে চলেছি বুঝলি? ডার্বি, রেঞ্জার্স, আইরিশ সুইপ্ কোনোটা বাদ দিচ্ছি না।...ব্যাটার ছেলের ভারী অহঙ্কার, ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করে। মুখের উপর রেজিগ্‌নেশন লেটারটা ছুঁড়ে মেরে যেদিন ঘ্যাচ্ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো, সেইদিন টের পাবে বাছাধন, বুঝলি?

ব্যাটার ছেলে অবশ্য বড়ো সাহেব!

মনে মনে হাসি। লটারীর টিকিটে টাকা পাওয়া? সত্যিকার জলজ্যান্ত চেনা কোনো লোককে পেতে তো দেখিনি কখনো। ঘটাইদা'র কী আশা! মানে—দুরাশা!

কিন্তু?

কিন্তু এবার যা বলবো, সে প্রায় বানানো গল্পের মতো!

দুরাশা সফল হতে দেখেছো কারুর? এইরকম দুর্দ্দান্ত দুরাশা? আইরিশ সুইপে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতে দেখেছো কখনো কাউকে? কই, আমি তো দেখিনি।

দেখলাম এই প্রথম।

# গল্প ভালো আবার বলো

দেখলাম আইরিশ সুইপে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে আমাদের ঘটাইদা। সেই সাধারণ চারখানা হাত-পাওলা চিরকালের ঘটাইদা!

উঃ! অবিশ্বাস করবার ইচ্ছে আর নেই, মানতেই হলো ভগবান্ আছেন!

পিসেমশাইয়ের গঙ্গা-লাভের পর বছর দশ বারো কেটে গেছে, কাজেই তখন আর হৈ হৈ করতে যেতে বাধা নেই। গেলাম!

হৈ হৈ করতে করতেই বললাম—ঘটাইদা, আর কেন? যা পেলে তাতে গুছিয়ে চলতে পারলে পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। লাখ খানেক টাকার সুদটা তো সোজা নয়? ব্যস্ এইবারে হাতী মেরে হাত সার্থক করে ফেলো?

সিগারেটটায় একটু সুখটান দিয়ে হেসে বলেন— [ পৃঃ—৭৯

ঘটাইদা'র পিঁপড়ে

# গল্প ভালো আবার বলো

মেরে হাত নষ্টর কথা মনে পড়ে গেলো বলেই হাতীর কথা তোলা।

ঘটাইদা অবাক হয়ে বললেন—হাতীটা কি?

বললাম—কেন? তোমার চাকরিটা? পিঁপড়ে তো এখন দিব্যি হাতী হয়ে উঠেছে! না কি সে সাধ আর নেই?

ঘটাইদা প্রথমটা বললেন—ও হো হো হো! সেই কথা? তারপর একটু যেন ক্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা হাসি হেসে বললেন—সাধ ঠিকই আছে বুঝলি, বরং আরো বেড়েছে। এখন আবার বড়ো সাহেব মানে জেনারেল ম্যানেজার ব্যাটা হয়েছে নতুন, আর মহা পাজী! আমার চাইতে বয়সে ছোটো, কাজের কাঁচকলাও বোঝে না, অথচ আমার ওপর আসে সর্দ্দারী করতে। ইচ্ছে করে দিই একখানা রেজিগ্‌নেশন লেটার নাকের ওপর ছুঁড়ে—

আমি মহোৎসাহে বলি—তা দিয়েই ফেলো না, এখন আর তোমার ভাবনা কি? বৌদি, তুমি আর পিসিমা, এইতো তিনটে লোক, লটারীর টাকাটা যা পেলে তাতে—

ঘটাইদা মুখের সামনের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়াটা ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বাঁ হাতে ধরা সোনালী ব্যাণ্ড সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে একটু উদাস হাসি হেসে বলেন—কথাটা ঠিক। তবে কি জানিস, টাকাগুলোকে রাখতে হবে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের কথা কি বলা যায়? হঠাৎ যদি ফেলই করে বসে!...ঘ্যাচ্‌ করে চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?

# বচন হাটার লক্ষ্মীলাভ

সরকারী প্রচার-দপ্তরে কাজ করি।

কেষ্ট-বিষ্টু কেউ নেই, নেহাৎ চুনোপুঁটি। ওই জলা-জঙ্গল ঠেলে মাঠে ঘাটে ঘুরে যদি কিছু 'বক্তিমে' ক'রে বেড়াবার দরকার হয় তো বেরিয়ে পড়তে হয় তল্‌পী-তল্‌পা নিয়ে।

একটা 'চাপরাশী' নামক জীব পাই, সে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব করে, সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে, আর আমি সাপ-ব্যাঙ্‌ যা পারি বকে বেড়াই।

এবারে ভার পড়েছে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে 'গ্রো মোর্‌ ফুডে'র প্রচারকার্য্য চালাবার।...কোথাও একদিন, কোথাও দেড়দিন, কোথাও এক-আধবেলা স্থিতি, তার মধ্যে যা পারি।

কাজ কতোটা হয়, সে জানেন ঈশ্বর, আর সরকার। আমরা নিমিত্ত মাত্তর!... এইরকম নানা জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে একদিন বিকেলের দিকে এসে নামতে হলো—"বচনহাটা" গ্রামে।

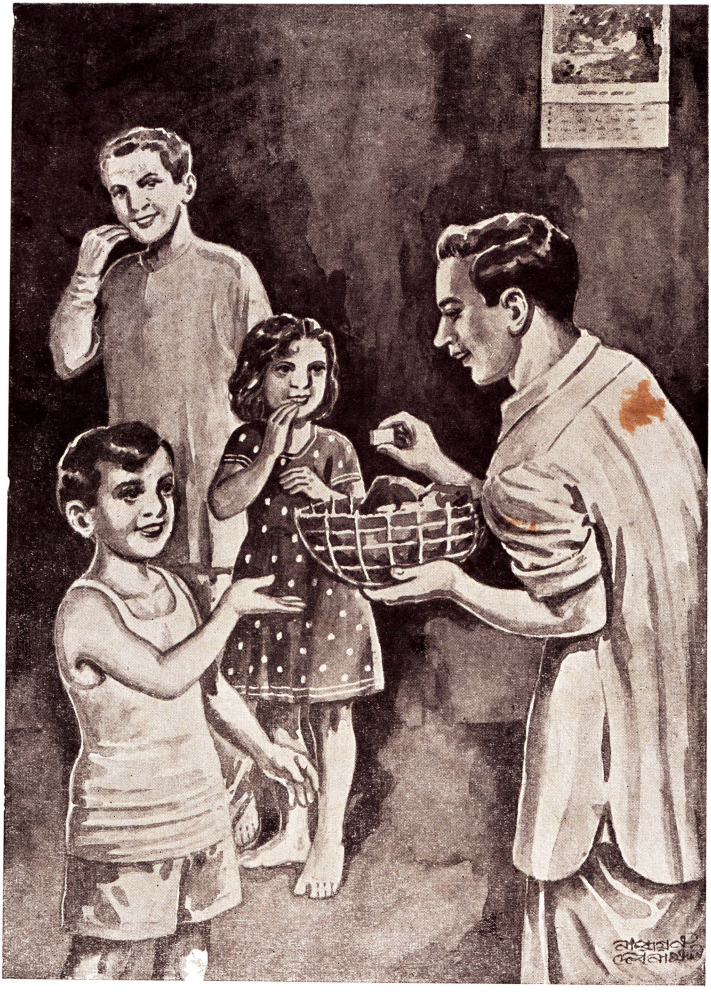

—সন্দেশের ঝোড়া হাতে নিয়ে বিলোতে লেগেছে……

# বলে ভালো আবার বলো

নামটা বেশ মজার—না? এ গ্রামের নাম নিশ্চয় শোনোইনি তোমরা? কেনইবা শুনবে? ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের নাম মুখস্থ ক'রে রাখবার সখ কার আছে বলো?

তবে হ্যাঁ—'অনিদ্রে রোগীর' কথা বলতে পারি না। অনিদ্রা রোগীর কথা উঠছে কেন বলছো? না, না, ঘুমের মাদুলী পাওয়া যায় এখানে তা ভেবোনা। আমি বলছি—অনিদ্রায় যারা ভোগে, তারাই—গভীর রাত্রে বাড়ীসুদ্ধ সকলে যখন নাক-ডাকার কন্‌সার্ট-পার্টি সুরু করে—তখন, 'মরিয়া' হয়ে খুলে বসে 'রেলওয়ে টাইম্ টেবল্', 'টেলিফোন গাইড্', 'কলিকাতার ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী', 'ভারতের পোঃ আঃ সমূহ'।

আমার অবশ্য অনিদ্রা অখিদে কিছুই নেই কখনো। সরকারি কাগজ-পত্রে প্রথম দেখলাম এই বচনহাটা গ্রামের নাম।

যাক্, নেমে তো পড়লাম ট্রেন থেকে। সঙ্গে চাপরাশী শ্যামকিঙ্কর।

এক মিনিটের ষ্টপেজ, লাফিয়েই নামা একরকম, কিন্তু ওরই মধ্যে শ্যামকিঙ্কর সবকিছু সামলে-সুমলে নামিয়েছে ঠিক।

শ্যামকিঙ্করের মতো লোক সঙ্গে না থাকলে আমার মতো লোকের যে কী দুর্দ্দশা হতো! লোকটা সত্যিই কাজের লোক। যেখানে যেমন অবস্থাতেই পড়ুক, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধেটি ঘটতে দেবে না কখনো। হয়তো রামপাখীর নামও যেখানে শোনেনি কেউ, সেখানে বের ক'রে বসবে ওই রামপাখীর ডিমের অমলেট। হোগলার চালার নীচে পরিবেশন করবে, মোগলাই খিচুড়ি! যে-রকম, পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে—মোটা-মোটা রোটা পেলেও কৃতার্থ হয়ে যেতে হয়, সেখানে সামনে ধ'রে দেবে ঢাকাই পরোটা! যেখানে—নুন ফুরোলে, মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়, সেখানে হাস্যবদনে 'সাপ্লাই' করবে, নোনা ইলিশ!

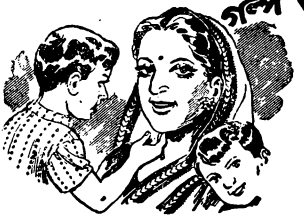

# গল্প ভালো আবার বলো

সঙ্গের ওই প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সটির গহ্বরে ওর যে কী আছে আর কী নেই, সে ভগবানই বলতে পারেন। হরেক রকম শিশি-বোতল কোটোবাটা দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। বাহারে শিশি-বোতল চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই, শ্যামকিঙ্কর ঠিক তাকে নিজের ভাঁড়ারে পুরে ফেলেছে। এই বাক্সটির জমকালো একটি নামকরণও করেছে শ্যামকিঙ্কর। কি, শুনবে? সেটি হচ্ছে, "সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম আগার"। বেশ নয়?

অবশ্য, সাধ্যপক্ষে বাক্সের রহস্যময় অন্তঃপুরটি ও আমার দৃষ্টিগোচর করাতে চায় না, কারণ, খেতে দিয়ে হঠাৎ অবাক ক'রে দেওয়াই ওর প্রধানতম সখ।

ওই সখটির জন্যে যখন যেখানে যাওয়া হয়, সেখানেই তলে-তলে সন্ধান ক'রে বেড়ায়, কোথায় কি রসনাতৃপ্তিকর বস্তু মেলে! কোন্‌টা বা নিজেদের উদরজাত ক'রে নেওয়া যায়, কোন্‌টাই-বা ওর "সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম আগারের"।

যাই হোক...

নামা তো গেল। 'আধ-পাঠশালা'-গোছের ইস্কুল একটা আছে নাকি শুনেছি, সেইখানেই উঠতে হবে ঠেলে। কিন্তু যতোই এগোই, দু'পাশে শুধু কচুবন।

শ্যামকিঙ্কর সেই অবাধ কচুবনের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলে—এখানে আসবার কি দরকার ছিল বাবু? ফসল তো আপনিই দেদার ফলে রয়েছে। এত খেয়ে উঠতে পারে গাঁয়ের লোক?

হেসে ফেলে বলি—তা বলেছো মিথ্যে নয়। আমাদের কপালেও আজ বোধ করি কচুপোড়া?

শ্যামকিঙ্কর মৃদু হাসে।

অর্থাৎ, খাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই। সে ঠিক আছে।

# গল্প ভালো আবার বলো

সেটা অবশ্য আমিও জানি, ইচ্ছে করেই বলি এ রকম কথা। শ্যামকিঙ্করের আত্মগরিমাটা যাতে আরো বাড়ে।

কচুবন ঠেলে-ঠেলে গ্রামের মধ্যে ঢোকার পর দু'চারজন লোকের চেহারা চোখে পড়লো। ইস্কুল-বাড়ীটা দেখিয়ে দিলো একজন। ডেকে আনতে গেল হেড্‌মাষ্টারকে।

খড়ে-ছাওয়া ইস্কুল-বাড়ীর দাওয়ায় ছারপোকা-কণ্টকিত একখানি তেঠেঙো বেঞ্চিতে একটু টান হয়ে বসি। সমস্ত শরীর আমলে উঠেছে যেন। উঃ, কী ঝকমারি কাজই ধরেছি বাবা! বর্ষার দিনের পড়ন্ত-বেলায় কচুবন ঠেলে মাইলখানেক হাঁটতে হ'লে তবে বুঝতে আমার দুরবস্থা!

মনে হচ্ছে, ভগবানের কাছে চাইবার যদি কিছু থাকে তো—একটি পুরু তোষক-পাতা পরিষ্কার বিছানা। কিন্তু, সে কি আর এ-জীবনে পাবো? চারিদিকে তাকিয়ে আশার চিহ্নমাত্র দেখছি না। সঙ্গের সম্বল—কম্বল বালিশই পেতে ফেলতে বলি শ্যামকে। ঘর খোলা পেতে হয়তো অনেক দেরী, ততক্ষণ দাওয়াতেই শুয়ে পড়লে মন্দ হয় না। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে।

শ্যামকিঙ্কর তো শুনে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।

—শরীর খারাপ করছে? বলেন কি বাবু? আমি যে—

সামান্য হেসে বলি—কি? ভূনি-খিচুড়ির ব্যবস্থা করছো নাকি হে? আজ আর বোধ হয় পেরে উঠবো না।

শ্যামকিঙ্কর করুণ সুরে বলে—না বাবু, খিচুড়ি-মিচুড়ি নয়, ফুল্‌কো-ফুল্‌কো দু'খানা লুচি করেই সারবো ভাবছিলাম। আপনার যদি শরীর খারাপ লাগে তবে থাক্।

বলি—সে কি হে, আমার জ্বর আসছে ব'লে, তুমি উপোস করবে নাকি?

# গল্প ভালো আবার বলো

—ছেড়ে দিন বাবু ও-কথা। চায়ের জলটা ফুটিয়ে নিয়ে স্টোভ নিবিয়ে দিইগে।

অর্থাৎ, ইতিমধ্যেই স্টোভ জ্বালা হয়ে গেছে।

অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু শ্যামবাবু অটল! নিজের জন্যে হাঙ্গামা সে করতে রাজী নয়।

এমন সময় হেড্‌মাষ্টারমশাই এলেন। আমরা সরকারী লোক, শুনে হৈ-হুল্লোড় ক'রে চাবি খুলে দিলেন ঘরের। কি খাবো জানতে চাইলেন, আমার জ্বর আসছে শুনে অনেক উপদেশ দিলেন, এমন আশ্বাসও দিলেন—যদি আদার রস দিয়ে চা খাই, বাড়ী থেকে একটু আদা পাঠিয়ে দিতে পারেন।

শ্যামকিঙ্কর অবজ্ঞাভরে ব'লে ওঠে—আদার দরকার নেই মাষ্টারবাবু, সে-সব আছে আমার "সরঞ্জাম-আগারে"। জলটা কোথায় পাওয়া যাবে তাই বলুন।

হেড্‌মাষ্টারমশাই সস্নেহে বলেন—জলের আবার ভাবনা, এইতো—দু'মিনিটের পথ, প্রকাণ্ড দীঘি রয়েছে। দরকার থাকে তো এই বেলা যাও, অন্ধকার গাঢ় হয়নি এখনো। ওই যে ডানহাতি রাস্তা ধ'রে সোজা...

শ্যাম চলে যেতে—যেন যথেষ্ট কর্ত্তব্য করা হলো এইভাবে আর-একবার গুছিয়ে বসেন মাষ্টারমশাই।

দারুণ গল্পের লোক। বেশ বোঝা গেল, একবার কাউকে কবলিত করতে পারলে সহজে ছাড়েন না। দেখছেন আমার জ্বর আসছে, হাই তুলছি, ভাল ক'রে শোবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছি, উনি কিন্তু গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন নির্ব্বিকারভাবে।...

—এই গাঁ এখন দেখছেন মশাই, শেয়ালের শ্বশুরবাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে, দিন-দুপুরে চরে বেড়াচ্ছে তারা। পঞ্চাশ বছর আগেও এমন ছিল না। দেখেছি তো ছেলেবেলায়, কী বোল্‌-বোলাও! পাল-পার্ব্বণ, যাত্রা-থিয়েটার, ক্রিয়াকাণ্ড লেগেই আছে দেশে। তেমনি প্রতাপ জমিদারের। যেমন—নানা উপলক্ষে বছরে পাঁচ-

# গল্প ভালো আবার বলো

সাতবার গাঁসুদ্ধু লোককে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 'মর্য্যাদা' দিতেন, গরীব-দুঃখীকে কাপড়, কম্বল বিলোতেন, তেমনি দুর্দ্দান্তও ছিলেন। আর, এখন?...বলতে গেলে হাড়ির হাল মশাই, হাড়ির হাল। ছেলে নেই কর্ত্তার। বর্ত্তমানে উপস্থিত বেঁচে রয়েছেন কর্ত্তার 'দৌত্তুর' যুগলকিশোর! তিনিই এখানকার জমিদার।...তা, সেই যে বলে, 'তালপুকুরে ঘটি ডোবে না' সেই অবস্থা। পঞ্চাশ বছর আগে যদি আসতেন মশাই—বুঝতেন শিবকালী চাটুয্যে সত্যি কথা বলছে কি মিছে কথা বলছে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার বিশ বছর আগে বচনহাটার সমৃদ্ধি দেখতে আসা সম্ভবপর ছিল কিনা সেটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হলেও চুপেই যাই, মেলা কথা বাড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে না। জ্বরটা খুব এসেছে।

একটু পরেই শ্যাম জল নিয়ে আসে, মাষ্টারমশাইও ওঠেন।

কিছু একটা বলা-হিসেবেই বলি—বাড়ী যাচ্ছেন? কাছেই বাড়ী, না?

একমুঠো নস্যি নিয়ে নাকের মধ্যে ঠুসতে-ঠুসতে হেড্‌মাষ্টার শিবকালীবাবু বলেন—হ্যাঁ, বাড়ী কাছে বটে, তবে যাচ্ছি দূরেই, এই একটু দাবার আড্ডা আছে। জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব আছেন, প্রকাণ্ড মন্দির। সেইখানেই আড্ডাটা বসে। যাবেন একবার দেখতে। ঐ রাধামাধবের পুরুত--জনার্দ্দন ভটচায্‌ হচ্ছেন গিয়ে—এ-অঞ্চলের বিখ্যাত দাবাড়ে। আপনি যতো বড়ো খেলোয়াড়ই হ'ন, ঠিক দাবড়ে দেবে আপনাকে।

হেসে বলি—তাহ'লে সন্ধ্যেটা ভালোই কাটে আপনাদের?

—রাধামাধবের ইচ্ছে! পাঁচটা ভদ্দরলোক এসে বসেনটসেন। যাবেন কাল, দেখবেন আমাদের দেশটা, আর আপনাদের ওই ফসলের লেকচার-টেকচারগুলো ঠাকুর-বাড়ীর উঠোনেই ব্যবস্থা করতে পারেন। গাঁয়ের সবাই আসে ওখানে। বিরাট জায়গা।

# গল্প ভালো আবার বলো

কাছা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে সেই বিরাট জায়গার উদ্দেশ্যে ধাবমান হ'ন শিবকালীবাবু, বোধ হয়, দাবার দাবড়ানি খাবার প্রবল আকর্ষণে।

শ্যামকিঙ্কর চা আনে, তার সঙ্গে আলুভাজা।

বললাম—এ হে, চা'টা হয়ে গেল? তাহ'লে ভদ্রলোককে দিলেই হতো এক পেয়ালা—

শ্যামকিঙ্কর বিরক্তভাবে বলে—আর থাক বাবু। যেমন দেশের ছিরি, তেমনিই ভদ্দর লোক তো! চা আর খেতে হবে না, কচুসেদ্ধই খাক। বলে কিনা—প্রকাণ্ড দীঘি! দীঘিই বটে। মজাপুকুর বাবু, স্রেফ্ মজাপুকুর! সিঁড়িগুলো সব ভাঙা গর্ত্ত, মরতে-মরতে রয়ে গেছি; দুটো বাসনপত্তর মাজতে-ঘষতে নিয়ে গিয়েছিলাম, হাত থেকে পড়ে কাদায় পুঁতে গিয়ে একাক্কার, হাতড়ে-হাতড়ে কুড়িয়ে আনতে এতো বিলম্ব! জঘন্যি দেশ!

গম্ভীরভাবে বলি—পঞ্চাশটি বছর আগে যদি আসতে পারতে শ্যাম, দেখতে দেশের কী বোল্-বোলাও!

—পঞ্চাশ বছর!

শ্যাম হাঁ ক'রে তাকায়—পঞ্চাশ বছর আগে আসতে বলছেন বাবু?

হাসি চেপে বলি—আসতে কি আর বলছি? যদি আসতে—তাহ'লে দেখতে! হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ক্রিয়া-কাণ্ড, যাত্রা-গান, খাওয়া-দাওয়া—সে একেবারে এলাহি কাণ্ড!

—ও! মাষ্টারবাবু খুব কায়দা ক'রে গেল বুঝি? তা, আগের জন্মে এসেছি কিনা কে জানে বাবু.....নিন, এখন চা-টুকু গলায় ঢালুন!.....খাবেন না আর কিছু?

—কিছু না! স্রেফ্ দুটি কুইনিন ট্যাবলেট। বেজায় শীত করছে।

# গল্প ভালো আবার বলো

সেই যে কুইনিন ট্যাব্‌লেট দুটি গলাধঃকরণ করে কম্বল মুড়ি দিয়েছিলাম,—তারপর কোথা দিয়ে এবং ক'টা দিনরাত্তির যে কেটে গেছে, খেয়াল মাত্র নেই। চৈতন্য হলে—শ্যামের মুখে শুনলাম, পুরো চারটি দিন নাকি কেটেছে এর মধ্যে। শ্যামাকিঙ্কর শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকী আছে। দেশে নাকি ডাক্তার বলতে একটা হাতুড়ে, কবরেজ বলতে একটা শকুনি-বুড়ো। তার কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়। বলে কিনা—"জ্বর-বিকার হয়েছে, সদর হাসপাতালে চালান ক'রে দাও।" শুনুন কথা? জ্বর-বিকার তোদের হোক।

—আরে, দূর! ও-কথা বলতে আছে মানুষকে? যাক, আমার জন্যে মুস্কিলে প'ড়ে গিয়েছো খুব?

—ও-কথা বাদ দিন বাবু। মুস্কিল আপনারই কি কম?

—তাই তো দেখছি, সরকারী প্রোগ্রাম, সব বানচাল

নাস্যি নাকে ঠুসতে-ঠুসতে শিবকালীবাবু বলেন...[ পৃষ্ঠা—৮৫

# গল্প ভালো আবার বলো

হয়ে গেল। কবে যে উঠতে পারবো! তা, তুমি এ-ক' দিন করলে কি? দেশের লোকের সঙ্গে চেনাশুনো হলো?

—দেশের লোক? দায়ে পড়ে চেনা করতে হলো বাবু, নইলে একটা কি মনিষ্যির মতোন? সম্প্রতি আবার গাঁসুদ্ধু লোক নাচন-কোঁদন সুরু করেছে, পুরুত ভট্‌চায্যি নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন।

—স্বপ্নাদেশ? সে আবার কিসের?

শ্যামকিঙ্কর দুইহাত উল্টে বলে—কি জানি বাবু, সবাই তো বলছে—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী না কি স্বপন দিয়েছেন, "আমি জলে পড়ে আছি, জমিদারকে বল্ আমায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করুগ। আমাকে অবহেলা করেই আজ তাদের এই দুর্দ্দশা—"

আমাদের পাপ মন, "বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী" শুনেই কেমন যেন গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ পাই, তাই হেসে বলি—কোথাকার জলে পড়ে আছেন তা কিছু বলেছেন? ক্ষীরোদ সাগরে, না, মানস সরোবরে?

—বাবু, আপনি কোথায় আছেন! স্বপন দিয়েছেন, আছেন এই এখেনেই। গাঁয়ের সকল দীঘি-পুকুর তল্লাসী হচ্ছে শুনে এলাম।

—তা, ভালো! লক্ষ্মী না উঠুন, কিছু মাছ-টাছ উঠবে।

এই পর্য্যন্ত শোনা ছিল।

সাবু খেয়ে পড়ে আছি। শ্যামকিঙ্করের পাত্তা নেই। এরকম কর্ত্তব্য[illegible]ক্ও নয়, বোধ হয় নেহাৎ "লক্ষ্মীদর্শনের" আশাতেই কর্ত্তব্যের ত্রুটি।

বিকেলের দিকে এলো একথালা ফল-পাকড় সংগ্রহ ক'রে, সঙ্গে [illegible] শিবকালীবাবু।

নস্যি ঠুসতে-ঠুসতে দরাজ-গলায় প্রশ্ন করেন—এই যে, উঠেছেন? দিন

# বলে ভালো আবার বলো

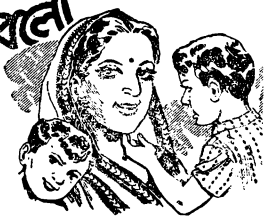

খুব দেখালেন মশাই! ম্যালেরিয়া আছে বুঝি? আপনার এই লোকটি তো মশাই আমাদের দেশকে যাচ্ছেতাই করছে, "ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, ডালিম, বেদানা নেই" এইসব! কি বলবো বলুন! পঞ্চাশটি বছর আগে এলে

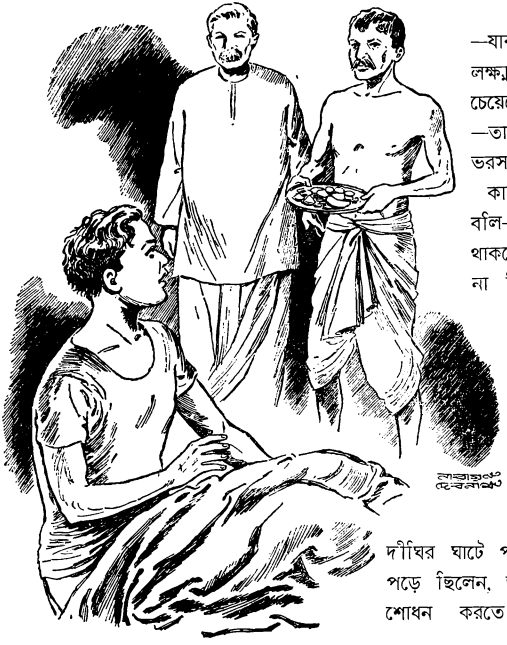

—যাক্, ভাবলাম, মা লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে চেয়েছেন, কিন্তু যা দেখছি —তাতে তো সম্পূর্ণ ভরসা হচ্ছে না!

কাতরভাব মুখে ফুটিয়ে বলি—কেন? বৈকুণ্ঠ ছেড়ে থাকতে রাজী হচ্ছেন না? না কি, নারায়ণ মামলা তুলেছেন?

হা হা ক'রে হেসে ওঠেন শিব-কালী—না, মশাই, মামলা-টামলা নয়। আর, মা নিজেই যখন আসতে চান—সহজেই উঠেছেন! দীঘির ঘাটে পাঁকের মধ্যে পঁুতে পড়ে ছিলেন, ভটচায্ নিয়ে গিয়ে শোধন করতে বসেছে। কিন্তু,

শ্যাম এলো একথালা ফল-পাকড় সংগ্রহ ক'রে, সংগে শিবকালীবাবু। [পৃঃ—৮৮

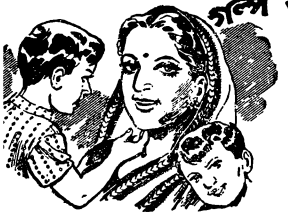

# গল্প ভালো আবার বলো

মায়ের মূর্ত্তি অঙ্গহীন! ওই তো সর্ব্বনেশে কথা! একখানি চরণ নেই।

হেসে ফেলে বলি—মা-লক্ষ্মীর চরণ জিনিষটা না থাকাই তো ভালো মাষ্টারমশাই, পালাবার পথ বন্ধ!

—বলেছেন মন্দ নয়!...আর একমুঠো নস্যি নিতে-নিতে শিবকালীবাবু হেসে ওঠেন—বেশ কথা কন আপনি। চঞ্চলা মা'র চরণ না থাকাই সুবিধে—কি বলেন? কিন্তু, অঙ্গহীন ঠাকুর পুজো করা চলে কি না—

বলি—তা চলবে না কেন? বাবা তারকেশ্বরের মাথায় চিঁড়ে কুটে খেয়ে-খেয়ে যে মাথাটা গর্ত্তই ক'রে রেখেছিল লোকে, পুজো চলছে না?

শিবকালীবাবু হঠাৎ যেন অন্ধকারে আলো দেখে লাফিয়ে ওঠেন।

—অ্যাঁ! তাইতো বটে! ঠিক বলেছেন! যতোই হোক, সহরের লোক আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তি, ব্রেন্‌টা ভালো। আচ্ছা মশাই, চল্লুম তাহ'লে—বলিগে। হাতের কাছে এতবড়ো উদাহরণ থাকতে...ভটচায্‌ বলছে, শাস্তর-টাস্তর দেখে তবে তা...এই তো শাস্তর সামনেই পড়ে রয়েছে। ঠিক ঠিক!

কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বলি—মূর্ত্তি তাহ'লে সত্যিই পাওয়া গেছে কিছু?

—যাবে না? বলেন কি? এ কি ছেলেখেলা? স্বপ্নাদেশ! পুরনো-আমলের পাথরের মূর্ত্তি, খেঁদো-খাঁদা হয়ে গেছে অবিশ্যি, কতো-কাল জলের মধ্যে পড়ে আছেন মা, আর ওই দক্ষিণ চরণটি একেবারে গেছে। পারেন তো.....একটু সারলে, ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে বসবেন না.....পাঁচটা ভদ্রলোক এসে বসেন।.....আজ খেলেন কি?

—সাবু ছাড়া আর কি? দেখুন না মুস্কিল! আপনার ইস্কুল জোড়া ক'রে রইলাম—

—বিলক্ষণ! তাতে কি? সে আমি সাতদিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছি ছোঁড়াদের!

# গল্পে ভালো আবার বলো

—আহাহা!...পড়ার ক্ষতি হলো ছেলেদের!

—রাম বলুন! এই এখন ঠাকুর উঠেছেন, আর কি পড়তো ছোঁড়ারা? মেয়ে-পুরুষের কাজ ঘুচে গেছে একেবারে। শুধু ওই আলোচনা...নমস্কার!

আর দাঁড়ান না ভদ্রলোক!

শ্যামকিঙ্করকে ডেকে বলি—কি হে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী দেখে এলে?

শ্যাম ছুরি দিয়ে ডাঁসা পেয়ারা কুচোতে-কুচোতে বলে—সে সৌভাগ্যি আর হলো কই বাবু? মান্যি-গণ্যি বেক্তিরাই সুধু দেখাদেখি করলেন চুপিচাপি। শুনছি—কাল নাকি পাব্লিকের জন্যে বের করবে। সত্যিই কিন্তু আশ্চর্যি! কতকালের ঠাকুর যুগ-যুগ ধ'রে জলের নীচে পড়ে আছেন, কেমন স্বপনটি দিয়ে উঠলেন! পুজো খাবার ইচ্ছে হলেই ওঁরা অনন্ত-শয়ন থেকে ওঠেন। তাই না বাবু?

—খুব সম্ভব। আমি হেসে বলি—এই যেমন আমি, ডাঁসা পেয়ারা খাবার ইচ্ছেয় অনন্ত-শয়ন থেকে উঠলাম!...এবেলাও কি সুধুই সাবু চালাবে?

—না বাবু, দুটো চিঁড়ে ভাজা দেবো ভাবছি। ম্যালেরিয়া জ্বর, কিছু হবে না।

বললাম—তুমি কি করছো এ ক'দিন? হরিমটর?

—ও-কথা যেতে দিন বাবু, চিঁড়ে দুটো জলে ফেললেও, পেট্টা ভরে যায় লোকের। কাল কি খাবেন তাই বলুন! একটা জায়গায় দিব্যি লক্‌লকে কুমড়ো-ডাঁটা দেখে এলাম, জ্বরের মুখে ঝাল-ঝাল ছেঁচ্‌কি মন্দ লাগবেনা বোধহয়। আর দু-খানা শুকনো রুটি। হতভাগা দেশে পাঁউরুটি তো মিলবে না!

শ্যামকিঙ্করের চিন্তাজগতে শ্যামের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু রসনার আর জঠরের। তা'বলে নিজের নয়—অপরের।

বলতে গেলে—একরকম মহাপুরুষ বেক্তি কি বলো?

# গল্প ভালো আবার বলো

পরদিন।

শুনলাম সন্ধ্যার পর রাধামাধবের মন্দিরের দালানে "পাবলিকের জন্য দর্শন" নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। আরতির সময় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই জড়ো হয় মন্দিরে, তাই এই ব্যবস্থা।

শ্যামকিঙ্কর ওকালতির ভঙ্গিতে বলে—বাবু, পারবেন না কি? চলুন না ধীরে-ধীরে। হতচ্ছাড়া দেশে পয়সা দিলেও তো একখানা রিক্‌শা মিলবে না? চাষাদেরই পোষায় এসব দেশ। যাক গে, পারেন তো চলে চলুন, কিছু মজা দেখে আসি।... অবিশ্যি দেবতার লীলা, বলতে কিছু নেই। আমি তো ভাবছিলাম—গেলেও হতো।

অর্থাৎ, উনি যাবেনই মনস্থ করেছেন। কারণ, শ্যামকিঙ্করের 'ভাবা' এবং 'করার' মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই।

বললাম—তা চলো, মন্দ কি! পাঁচটা মানুষের মুখও দেখা যাবে তবু। এসে অবধি তো কম্বল সম্বল করে পড়ে আছি।

শ্যামবাবুর অভিভাবকত্বে মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে গেলাম ধীরে ধীরে।

গিয়ে কিন্তু—সত্যিই বলছি অবাক বনে গেলাম।

মাস্টারমশাইয়ের উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, তা এই 'ঠাকুরবাড়ী' দেখলেই বিশ্বাস হয়।

এই কচুবনের অন্তরালে যে এতবড়ো বিরাট ব্যাপার থাকা সম্ভব তা চোখে না দেখলে ধারণা করা শক্ত। আমাদের দেশে এইরকম কতো বিরাট-বিরাট প্রাসাদ মন্দির, পুরণো দিনের ঐশ্বর্য্যের ভগ্নাবশেষ যে কচু-ঘেঁচুবনের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে, কে তার হিসাব রাখছে?

মার্ব্বেল পাথর পাতা প্রকাণ্ড দালানে, জীর্ণ হলেও—বিরাট জাজিম পাতা জায়গা! একশো বাতির ঝাড়ের, সবগুলো না হোক—অনেকগুলো বাতি জ্বালা

হয়েছে। 'চিক' ফেলে আলাদা-করা মেয়েদের জায়গা। যদিও সেই চিকের পর্দাগুলি যে পঞ্চাশটি বছর আগের "বোল্‌বোলাও যুগের", সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না দেখলে।

যাই হোক—জীর্ণ হলেও সর্ব্বত্র ঠাট বজায় আছে।

বিগ্রহ দুটিও দিব্যি বড়োসড়ো। সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা। বোধহয় আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে সিন্দুক থেকে বেরিয়েছে গহনা-পত্র।

বেশ সমীহ নিয়েই ঢুকলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে শিবকালীবাবুর চোখে পড়ে গেলাম।

—এই যে, আসুন আসুন—ব'লে তিনি একেবারে মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন।

যদিও 'চৌদ্দশাকের মধ্যিখানে ওল' পরামাণিকের মতো বসতে হ'লে খুব যে স্বাচ্ছন্দ্য লাগে তা নয়—তবে একটা সুবিধে হলো। জমিদার যুগলকিশোর মশাইকে বেশ নিরীক্ষণ করবার সুযোগ পেলাম। আমার থেকে হাত দুই দূরে তাঁর আসন। লোকটাকে দেখবার ইচ্ছে একটু ছিল।

যুগলকিশোর ব'সে আছেন একেবারে নবাবী কায়দায়।

ঠিক ঝাড়লণ্ঠনের নীচেই বরের আসনের মতো ভেলভেটের তাকিয়া-টাকিয়া দেওয়া বিছানা পাতা। দু'পাশে ফুলের তোড়া না থাকলেও একপাশে পুরণো আমলের যে সেকেলে গুড়গুড়িটি রয়েছে, সেটির বাহারও বড়ো কম নয়।

তামাক টানছেন না বটে, তবে নলটি আলগোছে হাতে আছে।

চেহারাটিও বেশ রাজসই।

মাষ্টারমশাই বর্ণিত 'হাড়ির হালের' চিহ্ন এখন অন্ততঃ দেখলাম না। তবে—এটা বোধহয় দরবারের দৃশ্য। গালচে তাকিয়া গুড়গুড়ি ঝাড়লণ্ঠনগুলোও যে অন্ততঃ বেচে খান্‌নি এর জন্যে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে।

# গল্প ভালো আবার বলো

আমাকে দেখে তিনি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন।

শিবকালীবাবু বললেন—এই যে, এঁর কথাই বলছিলাম চৌধুরীমশাই।

চৌধুরীমশাই বেশ নবাবী-'টোনে' বলেন—

—ও! তাই নাকি? আছেন কেমন? শুনলাম, আমাদের দেশে এসে জ্বরে পড়েছিলেন!...ভালো আছেন তো?

অমায়িকভাবে বলি—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—ভালো! ভালো! কিসের ইন্‌সপেক্‌শনে এসেছিলেন যেন?

ব্যস্তভাবে বলি—না না, ইন্‌সপেক্‌শনে কিছুর নয় তো! গভর্ণমেণ্ট থেকে ওই যে একটা "গ্রো মোর ফুড" মুভমেণ্ট চালানো হচ্ছে...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। বেশ তো—দিন না একদিন লেকচার-টেকচার, বেটা চাষাগুলোর একটু শিক্ষে হোক।

যথেষ্ট ভদ্রতা হয়েছে এই ভেবে চৌধুরীমশায় হাতের নলটি মুখে তুলেছেন। অর্থাৎ, হলেও সরকারের লোক, আমাদের মতো চুনোপুঁটির সঙ্গে এর বেশী কথা চালানো চলেনা। হ্যাঁ, হতো যদি জজম্যাজিষ্ট্রেট্, জমিদারী বাঁধা দিয়েও তাদের আদর আপ্যায়ন করা হতো।

আর কিছু কথা হবার আগেই আরতি আরম্ভ হলো।

রুপোর পঞ্চপ্রদীপ, রুপোর বাঁট-দেওয়া চামর ইত্যাদি।

সেকেলে বুড়োগুলো বোকা হলেও, বুদ্ধি ছিল তাদের।

সম্পত্তি-টম্পত্তিগুলো একেবারে ঠাকুর দেবতার নামে এমনভাবে রিজার্ভ ক'রে যেতো যে, কেউ আর কিছু বেচে খেয়ে ফেলতে পারে না।

আরতি শেষ হ'তে অনেকক্ষণ লাগলো।

তারপর চরণামৃত বিতরণ। বোঝা যাচ্ছে—লক্ষ্মীদর্শনের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠছে সকলে।

# গল্প ভালো আবার বলো

অবশেষে—পুরোহিত মহাশয় লাল শালুতে-মোড়া একটি দ্রব্য একখানি রুপোর থালায় করে এনে ঠিক মাঝখানে জলচৌকীর উপর বসিয়ে দিলেন। এতক্ষণে বুঝলাম, যুগলকিশোর চৌধুরীর সামনা-সামনি খালি একটা জলচৌকী পাতা রয়েছিল কেন।

ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে লোকের মধ্যে। সকলেই ঝুঁকে পড়ে মাথা বাড়িয়ে দেখতে চায় স্বপ্নে-পাওয়া লক্ষ্মীমূর্ত্তিকে। কিন্তু, তিনি আপাততঃ বোরখার আড়ালে!

মিনিট-খানেক স্তব্ধতা! শুধু যুগলকিশোরের তামাক টানার একটানা মৃদু শব্দ।...

তারপর—

যুগলকিশোর হাতের নল নামিয়ে তাকিয়ার ঠেস ছেড়ে সোজা হয়ে বসেন। যেন বলতে চান কিছু-মিছু।

সত্যিই তাই। গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে বার দুই কেসে তিনি বলতে আরম্ভ করেনঃ

—আপনারা অনেকেই আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এবং সকলেই বোধ হয় জানেন, আমাদের বচনহাটার পলাতকা লক্ষ্মী, নিজের ইচ্ছেয় আবার এখানে ফিরে এসেছেন। স্বপ্ন পেয়েছেন আমাদের ভটচায্‌মশাই।...স্বপ্ন বিবরণটা সকলকে একবার শুনিয়ে দিন ভটচায্‌মশাই।

ভটচায্‌ করযোড়ে সুরু করেন—বলবো কি চৌধুরীমশাই, বলতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে! বুধবারের শেষরাত্তির—বেস্পতিবার পড়-পড়; এমন সময় স্বপ্ন দেখলাম—এই মন্দিরের বন্ধ দরজা থেকে কে যেন আমার নাম করে বলছে, "ওরে অনেকদিন জলে পড়ে আছি, তুই আমায় তুলে নিয়ে যা।"...বললাম, মা, তুমি কে? ...আবার শুনলাম—"আমি জমিদারবাড়ীর লক্ষ্মী, চলে গিয়েছিলাম, আবার এলাম।

# গল্প ভালো আবার বলো

যুগলকে বল্, আমার পুজোর ব্যবস্থা করতে।"...কাতর হয়ে শুধোলাম—মা, চৌধুরীমশাই যদি আমার কথা গেরাহ্যি না করেন?...বললেন, "না করলে তারই অনিষ্ট। গাঁয়ের সমস্ত জলাশয় তল্লাস করতে বল্, আমায় পাবি।"...তারপর তো সবই জানেন আপনারা। দীঘির ঘাটে পাঁকের মধ্যে—নারায়ণ! নারায়ণ!

ভটচায্ থামতেই চৌধুরী চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে সুরু করেন—এখন এই বিগ্রহের পূর্ব্ব ইতিহাস আপনাদের কিছু জানা আবশ্যক। এ ইতিহাস আমি শুনেছি আমার দিদিমার কাছে। আমার বৃদ্ধপ্রমাতামহ 'রাজনারায়ণ রায় কাজ করতেন ঢাকায় নবাব সরকারে। খুব প্রতিপত্তি, বিস্তর রোজগার, এমন সময় বাধলো ওপরওলাদের সঙ্গে খিটিমিটি! তেজী লোক, অত মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলেন ধাঁ করে।...যেদিন তল্পি গুটিয়ে চলে আসবেন, তার আগের রাত্রে স্বপ্নাদেশ পেলেন, "তুই চলে যাবি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা, আমি নবাব বাড়ীর লক্ষ্মী, কিন্তু আর থাকতে ইচ্ছে নেই, এবারে তোর ঘরে অধিষ্ঠান হবো আমি।" উনি জানতে চাইলেন, "মা, তোমায় কোথায় পাবো?" আবার আদেশ হলো,—"এই ঘরের দক্ষিণ কোণ খুঁড়ে দেখ—"... চৌধুরীমশাই একটু দম নিয়ে ফের সুরু করেন, "কাউকে বললেন না,-নিজেই লেগে গেলেন শাবল নিয়ে, এদিকে ভয়ে আছেন ঠাকুরের গায়ে না ঘা লাগে! মায়ের দয়া—তামার একটি হাঁড়ির মধ্যে পাওয়া গেল, আঁচড়টি লাগলো না। অবিশ্যি মূর্ত্তি এমন কিছু নয়, মোটা পাথরের। সেই রাত্রেই যথাসর্ব্বস্ব জিনিষ-পত্র আর ঠাকুরটি নিয়ে পালিয়ে এলেন তিনি, কারণ সকাল হ'লে ঘর খোঁড়া দেখলে লোকে হৈ-হৈ করবে। তখনকার দিনে পথক্লেশ বড়ো সোজা ছিল না, দীর্ঘদিন পরে এই গ্রামের ধারে বিশ্রাম নিতে ব'সে জায়গাটি বড়ো ভালো লাগলো তাঁর, বললেন,—'দেশে আর যাবো না, এখানেই থাকবো'—নদে জেলার কোথায় যেন দেশ ছিল আগে...ব্যস্! লেগে গেল বাড়ী তৈরীর ধুম। বাড়ী তো নয়, প্রাসাদ। দেখছেন তো এখনো!

—বাড়ী যাচ্ছেন ? কাছেই, বাড়ী, না ?

# গল্প ভালো আবার বলো

মা লক্ষ্মীর কৃপায় অভাব বলতে কিছু নেই, প্রচুর অর্থ হাতে—" চৌধুরী আবার একটু থামেন।

আমার পাপমন, ভাবি, ওই জন্যেই বোধহয় নবাব-সরকারের চাকরিটা গেল।

মায়ের দয়া—তামার একটি হাঁড়ির মধ্যে পাওয়া গেল...। পৃঃ—৯৬

অত 'প্রচুরভাবে' হাতালে ওপরওলারা কি আর মাথায় ক'রে নাচবে? নবাবের ভাঁড়ারের লক্ষ্মী নিজের ভাঁড়ারে পুরেছিলেন, বোঝাই যাচ্ছে।

চৌধুরী আবার সূত্র ধরেন—হ্যাঁ, কি বলছিলাম, মা-লক্ষ্মীর কৃপায় অর্থের অভাব নেই, সমস্ত গ্রামটা নিলেন কিনে, কিনলেন আশে-পাশে আরো পাঁচ-সাতটা গ্রাম। বসা-লেন প্রজা...কী যে তাঁর দাপট! তার-পরে নির্ম্মাণ হলো এই দেবমন্দির!

আমি হঠাৎ কৌতূহলের বশে বলে ফেলি—এ তো দেখছি, গড়ানো রাধাকৃষ্ণ, সেই স্বপ্নাদিষ্ট ঠাকুরের কি হলো?

● বচনহাটার লক্ষ্মীলাভ

# গল্প ভালো আবার বলো

যুগলকিশোর আমার দিকে যুগলদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তাচ্ছিল্যভরে বলেন—মা-লক্ষ্মী তো পাবলিকের জিনিষ নয়, তিনি থাকলেন বসত-ভিটেয় ধানের হাঁড়িতে। এখানে এই বিগ্রহ গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিরাট দেবত্র সম্পত্তি—রথ, দোল, রাস, ঝুলন, জন্মাষ্টমীতেই-বা কী ঘটা! শুনেছি, অন্নকূট হতো, তার অন্নের চুড়ো উঠতো মন্দিরের ছাদ-বরাবর! পুকুর কাটা হতো—ক্ষীর আর দইয়ের! যাক, সে আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন পুরনো লোকদের কাছে। এখন বললে রূপকথা শোনাবে। তিনি তো ওইভাবে রাজ্যবৃদ্ধি করতে-করতে দেহ রাখলেন, তারপর তাঁর ছেলে—অর্থাৎ আমার প্রমাতামহ অনন্তনারায়ণ হলেন জমিদার, তিনিও বাপের চাইতে কম নন, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি তেজ, তেমনি দাপট! হবে না কেন, স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরে অধিষ্ঠিত। বাড়-বাড়ন্তর সীমা-পরিসীমা নেই।...কিন্তু জানেনই তো, লক্ষ্মী চঞ্চলা! 'কাল' হলো একটা মালী ছোকরা। রোজ বেটা ফুল জোগাতো, আর দেখতো, মা-লক্ষ্মীর সোনার মুকুট, সোনার পেঁচা—দেখতে-দেখতে মন না মতিভ্রম, লোভ হলো বেটার! তাড়াতাড়িতে গয়না খুলতে না পেরে একেবারে ঠাকুরকেই একদিন চুরি করে বসলো। হতভাগা গয়না নিলি, নিলি—দু'খানা গেছে, দশখানা হতো—তা নয়, ঠাকুরকে ঘোচালি? আমাদেরই কপাল! ভয়ে-ভয়ে ছোঁড়া মা-লক্ষ্মীকে জলে ফেলে দিলো।

—তারপর?

রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করেন শিবকালীবাবু।

—তারপর আর কি? ছোঁড়াকে ধরে জলবিছুটি দিয়ে মেরে শেষ করে ফেলা হলো মশাই, কিন্তু ঠাকুর তো পাওয়া গেল না আর! শুনেছিলাম, সাতদিন ধরে দেশের সমস্ত জেলে সাতখানা গাঁয়ে সমস্ত দীঘি পুষ্করিণী হাঁটকেছে! একমাস ধরে লোকে পুকুরের জল মুখে করতে পারেনি, ঘুলিয়ে এত কাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সবই

# গল্প ভালো আবার বলো

বৃথা। ওই যে বললাম—মা চঞ্চলা! ব্যস্, তার পর থেকেই সুরু হলো ভাঙন! আমার দাদামশাই যাও-বা রেখেছিলেন, সব ঘোচালেন মামা।

সমস্ত লোক নিথর হয়ে শুনছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করছি প্রত্যেকের মুখেই যেন কি একটা 'বলি-বলি' ভাব। শেষ অবধি আর কেউ বলেন না, বলেন—শিবকালীবাবুই—আশ্চর্য্য! এ যে অপূর্ব্ব কথা শোনালেন চৌধুরীমশাই। কই এতকালের মধ্যে কখনো তো শুনিনি এ-সব?

—শুনবেন কোথা থেকে! চৌধুরী নাটকীয় ভঙ্গীতে মৃদু হাসেন, সে-ও ওই মায়েরই আদেশ! জেলেরা যখন জাল ফেলতে-ফেলতে হত্যে হয়ে যাচ্ছে, তখন আবার একদিন স্বপ্নাদেশ—"ওরে, মিথ্যে চেষ্টা করিস, এখন কিছুকাল আমি অনন্ত-শয়নে থেকে নারায়ণের সেবা করবো।...পরে—যদি ইচ্ছে হয় আমার, আসবো এই ভিটের পুজো খেতে। যতোদিন না ফিরি, এ-কাহিনী প্রকাশ করিসনি।" দিদিমা বলতেন আর কাঁদতেন, যে, "আমার আমলেই মা অন্তর্দ্ধান করলেন!" সেই শূন্য চৌকীটিতেই তিনি রোজ ফুল চন্দন ধুনো গঙ্গাজল দিতেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এ-কাহিনী মৃত্যুকালে চুপি-চুপি আমাকে বলে যান। মামা তখন মারা গেছেন তো! নিষেধ ছিল—এতদিন মন্ত্রগুপ্তি করে রেখে দিয়েছিলাম। আজ মা ফিরে এসেছেন, তাই শুনতে পেলেন আপনারা। নারায়ণ! নারায়ণ!

জনতার মধ্যে থেকে এইবার একটা অসহিষ্ণুতার আভাস পাওয়া যায়!...

—"মায়ের দর্শনটা হয়ে যাক—"..."অনেকক্ষণ বসে আছি ঠাকুরমশাই।"

..."দেখান এবার" "রাত ঢের হলো ভটচায্, এবার দেখিয়ে দেওয়া হোক—" ইত্যাদি শব্দ ওঠে নানান কণ্ঠে।

—হ্যাঁ, দেখাবো! দেখাবো বলেই তো এখানে সকলকে ডাকা, তবে মা আমার সূক্ষ্মমূর্ত্তি নয়—শালুর মোড়ক খুলতে-খুলতে ভটচায্ বলেন—মোটামুটি চেহারা মায়ের, তাও জলে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে খাঁদা-বোঁচা হয়ে গেছেন, দক্ষিণ চরণখানি গেছে উড়ে।

# গল্প ভালো আবার বলো

তবু পূর্ব্বকালের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ যখন, তখন অবহেলা করা চলবে না। তা'ছাড়া—মা নিজে এসেছেন ইচ্ছে করে। জয়-মা! এই দেখুন সকলে!

একযোগে গলা বাড়ায় সকলে—আমিও ঝুঁকে পড়ি, আর সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে খাই অন্তর্টিপুনী? দু'টো আঙুলে কে যেন জোরসে খোঁচা দিলো।

ব্যাপার কি!

ফিরে দেখি শ্যামকিঙ্কর। শ্যামকিঙ্কর এভাবে আমাকে খোঁচা দিলো! অবাক হয়ে তাকাই, দেখি তার মুখ-চোখ উত্তেজনায় রক্তবর্ণ, বোঝা গেল, আবেগের বশে ও কি যে করেছে নিজেই জানে না।

—কি হে, ব্যাপার কি?

চুপি-চুপি প্রশ্ন করি।

—বাবু, বাবু, স্রেফ ধাপ্পাবাজি, আগাগোড়া ধাপ্পা। একেবারে দিনে ডাকাতি!

ফিস্‌ফিস্‌ করেই বলে বটে, কিন্তু এত উত্তেজিত মুখ যে, দেখে মনে হয়, ফেটে পড়বে বুঝি। হতভম্ব হয়ে, বলি—কিসের ধাপ্পা? কোথায় ডাকাতি?

—এই সভার মধ্যে। আমি কিন্তু চেঁচাবো বাবু! জোরসে চেঁচাবো।

—চেঁচাবো? চেঁচাবো কি হে? কি হলো তোমার?

—যা হলো সে আর আপনাকে কি বলবো বাবু? ডাক ছেড়ে সবাইকে শুনিয়ে দিই সে বিত্তান্ত। আপনি কিন্তু মানা করবেন না।

ততক্ষণে সভার মধ্যে গোলমাল সুরু হয়ে গেছে। ভিড় ভাঙছে, প্রত্যেকেই নানা মন্তব্য করছে। চাপা গলায় নিজেরা কথা কই—তোমার কথা তো আমি কিছু বুঝছি না শ্যাম, ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার এই—ওটা লক্ষ্মী, না কাঁচকলা! গোদার মা...ঢিপি!

—সর্ব্বনাশ! চুপ্‌ চুপ! এদের কানে গেলে আস্ত রাখবে না তোমাকে।

# গল্প ভালো আবার বলো

সেকেলে-আমলে ও-রকম ঢিপি-ঢাপা মূর্ত্তি থাকতো! লক্ষ্মী কি গণেশ বোঝা দায়। যাক্, চলো কেটে পড়ি।

—চলে যাবো কি বাবু? আমার যে জিভ নিস্‌পিস্ করছে। বাবু আমি চেঁচাই...

আমি অবাক হয়ে বলি—তুমি কি ক্ষেপলে নাকি শ্যাম? ওদের লক্ষ্মী-প্রতিমার চেহারা—যম গোদার মা'র মতো হোক, চাই 'বীরভদ্দরে'র মতো হোক, তোমার কি?

—মূর্ত্তির কথা হচ্ছে না বাবু, কিন্তু এ যে পুকুর-চুরি। ওই যম গোদার মা.....

শ্যামকিঙ্করের কথায় ছেদ পড়ে, আমাদের উঠন্তভঙ্গী দেখে শিবকালীবাবু এগিয়ে এসে গদগদ কণ্ঠে বলেন—শুনলেন তো সব! উঃ! তাজ্জব বনে যেতে হয় একেবারে।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খায় শ্যামকিঙ্কর, আমি উত্তর দেবার আগে উত্তর দেয় সে—সে যা বলেছেন মাষ্টারমশাই, তাজ্জবই বনছি।

—হবেই তো! শিবকালী চাটুয্যে হৃষ্টবদনে বলেন—যে শুনবে সেই বলবে, এ যে একেবারে রূপকথার মতন!

—'মতন' কেন মাষ্টারমশাই, রূপকথাই যে!

এদিকে আবার আমি শ্যামকিঙ্করের কথাবার্ত্তা শুনে তাজ্জব বনছি। বেশ! বুঝলাম—তোর তেমন বিশ্বাস হয়নি, তা ব'লে তাই নিয়ে বচসা বাধিয়ে বসবি নাকি! এতই-বা উত্তেজিত হবার কি আছে। তাড়াতাড়ি 'স্থানত্যাগের' নীতি অনুসরণ করাই দেখছি মঙ্গল। তাই নিজে দাঁড়িয়ে উঠে একরকম ঠেলেই নিয়ে যাই শ্যামকিঙ্করকে।

এগোচ্ছি—হঠাৎ জমিদার যুগলকিশোর বোধকরি আমাদের উপর নিতান্তই কৃপা দেখাতে, বিলম্বিত নাটুকে-সুরে বলেন—যাচ্ছেন নাকি! নমস্কার—। ভালো

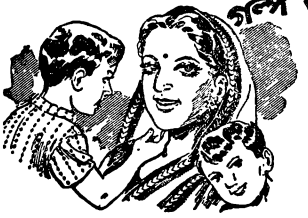

# গল্প ভালো আবার বলো

কথা, আপনার সেই লেকচার না কি যেন, কবে দিচ্ছেন? বলেন তো—এ বেটাদের জানান দিয়ে রাখি, সরকারি কাজ আপনার, সাহায্য করাই তো দরকার—

সাহায্যের দরকার না হোক, উত্তর একটা দেওয়া দরকার আমার দিক থেকে, কিন্তু শ্যাম আজকে ক্ষেপে গেছে।

হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গীতে ব'লে ওঠে—বাবুর লেকচার তো "ফসল বেশী ফলাও" এই বৃত্তান্ত? সে আর এ-গাঁয়ে দরকার নেই চৌধুরীমশাই! বাড়তি বাজে খরচ! এ বড় 'উর্ব্বরা' দেশ!

এ-রকম তুচ্ছ ব্যক্তির মুখে 'চৌধুরীমশাই' সম্ভাষণ শুনে বোধকরি কুপিত হন ভদ্রলোক, আরো বিলম্বিত তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন—কেন বল তো হে?

শ্যামকিঙ্করও সরকারের চাকর কাউকে ডরায় না।

'সরকারের চাকর' ব'লে আত্মমর্য্যাদা বোধ, পেয়াদা পিয়ন চাপরাশী দারোয়ান-দেরই বেশী হয়। তাই বেশ গম্ভীর চালেই বলে—সে আর আপনাকে বেশী কি বোঝাবো বাবু? বুদ্ধিমান বেক্তি আপনারা, নিজেই বুঝবেন! দেখছি তো, এ-গাঁয়ে চাষ করতে জমির প্রয়োজন হয় না, হাওয়ায় ফসল ফলে। একবার ম্যাজিক দেখে-ছিলাম যাদুসম্রাট্ পি, সি, সরকারের, আর-একবার দেখলাম আপনাদের এখানে... পাঁচমিনিটে আঁটি পুঁতে গাছ গজিয়ে ফল খাওয়ানো। মনে থাকবে অনেকদিন। আচ্ছা, পেন্নাম হই।

বাইরে এসে তবে আমার বাকস্ফূর্ত্তি হয়—ব্যাপার কি বল তো শ্যাম? তুমি হঠাৎ—

—হঠাৎ? বলেন কি বাবু? খুব যাই সহ্যশক্তি আমার তাই 'নির্ব্বাক্' হয়ে চলে এলাম! সাতপুরুষের লক্ষ্মী! স্বপ্ন দিতে এসেছেন ওনাদের। আমার মরিচ গুঁড়োবার পাথরখানা...

# গল্প ভালো আবার বলো

—মরিচ গুঁড়োবার পাথর কি হে? কি বলছো?

শুনে আমিই প্রস্তরীভূত হয়ে যাই।

—যা সত্যি তাই বলছি বাবু, ঠ্যাঙভাঙা গোদা পুতুলটা ফেলে দিয়েছিল আমার ভাইঝি, আমি কুড়িয়ে রেখেছিলাম মরিচ গুঁড়োনোর জুৎ হবে ব'লে।

বলা বাহুল্য, এটা বিশ্বাস্য কথা। জুৎসই জিনিষ চোখে পড়লেই শ্যামকিঙ্কর সেটি ওর "সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম আগারের" জঠর-জাত না ক'রে ছাড়ে না।

কিন্তু ও পাথর, যুগলকিশোরের হাতে যাবে কি সূত্রে? ছুঁড়ে তো আর মারেনি শ্যামকিঙ্কর!

অবিশ্বাসের সুরে বলি, ধেৎ কি ক'রে হবে? তোমার জিনিষ ওদের হাতে যাবে কি ক'রে?

যেতে আর বাধা কি বাবু? আসবামাত্তরই বাসনপত্তরের সঙ্গে ধুতে নিয়ে গিয়ে দীঘির জলে খুইয়ে এসেছিলাম ওটাকে। পড়ে গেল পাঁকে, বেশী আর হাতড়াতে সাহস হলো না। সন্ধ্যে হয়ে এলো। তুচ্ছ একটা পাথরের ঢিপি বৈ তো নয়।

তবু দ্বিধা ঘোচে না আমার।

দ্বিধাভরেই বলি, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছো?

—চিনতে পারবো না? শ্যামকিঙ্কর সবলে আমার দ্বিধা দূর ক'রে দেয়, বলে ওই পুতুল নিয়ে কতো হাসাহাসি কাণ্ড! দাদা কটকে বেড়াতে গিয়ে মেয়ের জন্যে কিছু ভালো খেলনা-পাতি না এনে—ওই গোদাহাতী মা যশোদা পুতুলটিকে নিয়ে এসেছিল ব'লে কতো হাসলো সবাই। আমি চিনবো না? আমি আজ দু'মাস ধরে মরিচ ঠুকে-ঠুকে সর্ব্বাঙ্গ খ্যাঁদা করলাম ওর!...যেমনি মিথ্যুক ভটচায্, তেমনি জোচ্চোর জমিদার! অ্যাঁ!

আমি হেসে বলি—তা, অত চটছো কেন হে? তোমার অবিশ্যি মরিচ ঠুকতে

# গল্প ভালো আবার বলো

আর-একটা নোড়ানুড়ি জুটে যাবেই, ওদের তো লক্ষ্মী-লাভ হলো? কিন্তু সার্থক নামটা বটে গাঁয়ের। এ-গাঁয়ের নামকরণ যে করেছিল, সে ভবিষ্যতদ্রষ্টা মহাপুরুষ বেক্তি ছিল বলতে হবে। বচনহাটা! উপযুক্ত নাম বটে।

শ্যামকিঙ্কর যে এত চিন্তাশীল, আগে জানতাম না। ও বেশ গম্ভীর চিন্তাশীলের ভঙ্গীতে বলে, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন বাবু? সেকালে নবাব-সরকার থেকে মানুষ-জনকে যেমন টাইটেল দিতো—"রায়" "চৌধুরী" "মল্লিক" "মজুমদার"—এ তেমনি নবাবী টাইটেল। খাদ্য-শস্যির তো অভাব ছিল না সেকালে...ফসলের বাড়বাড়ন্ত ছিল। অভাব ছিল বোধকরি—বচনের। সরকার থেকে তাই 'ফসল বাড়াও' হুকুম না দিয়ে 'বচন' বাড়াবার হুকুম দিতো। নিয্যস্ কোনোকালে এই গাঁ ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েছিল তাইতে। সেকেলে কত্তাদের বংশধররাই তো বিরাজ করছেন এখনো? তাই বচনের জোরে লক্ষ্মীলাভ।

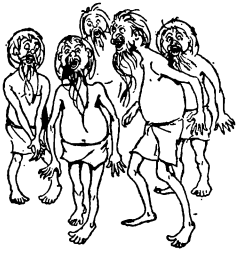

# মানিক চাঁদ

ছেলে নেই মেয়ে নেই, কিন্তু একটা ভাগ্নেকে নিয়েই ফতুর হ'তে বসেছেন সত্যহরিবাবু। নামেও মানিক, কাজেও মানিক।

মানিক ভালো খাবে, ভালো পরবে, ভালো বিছানায় শোবে। দামী তেল ভিন্ন মাথায় মাখবে না, দামী সীটে বসে ভিন্ন সিনেমা দেখবে না। চিরুনীটি থেকে জুতোর কালিটি পর্য্যন্ত আগাগোড়া সব দামী চাই মানিকের। সস্তা জিনিস সে ব্যবহার করতেই পারে না। আর সত্যহরি সেটা পারেন না বলে সে মামাকে ঠাট্টা করে—খরচ করো মামা, একটু খরচ করো! টাকা নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে?

সত্যহরি যদি বাজারে যান, মানিক বাজারের আনাজপাতিগুলো ধরে ধরে ব্যাখ্যান করতে বসে—বাজারে এর চাইতে পোকাটে বেগুন বুঝি আর ছিলো না মামা? ...বাঃ কী ফার্ষ্ট ক্লাশ কপিটা, দেখোতো মামী, ভেতরে বোধ হয় ঘুন ধরে এসেছে!... আরে! এগুলো আলু? আমি ভাবছিলাম সুপুরি!

নিজে যদি কোনোদিন বাজারে যায় মানিক, দশটা টাকার কমে ওর কুলোয় না। বেছে বেছে বাজারের সেরা জিনিসগুলি এনে হাজির করবে!

# গল্প ভালো আবার বলো

মামী যদি বলেন—এতো মাছ কে খাবে রে মান্‌কে? এই তো তিনটে মানুষের সংসার!

মানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—কার সংসারে কটা লোক সে তো কারুর গায়ে লেখা থাকে না মামী? হাতে করে এক পো আধ সের মাছ কিনবো কোন্ লজ্জায়?...সে পারে মামা! যেমন বেশভূষা করে যায়।...ফতুয়া গায়ে দিয়ে বাজারে গেলে এক পো মাছ কেনা চলে।...

মামী রাগ করে বলেন—তা ওর তো আর তোমার মতো পরের পয়সায় নবাবী নয়!

মানিক বলে—পরের পয়সা নিজের পয়সা বুঝি না মামী! পয়সা হচ্ছে খরচ করবার জিনিস, এইটাই বুঝি।...মামা এমন করে রাস্তায় বেরোয় 'মামা' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

সত্যহরির গিন্নীটি তা বলে সত্যহরির মতো ভালো মানুষ নন, বেশ একটু দজ্জাল গোছের। তিনি চটে উঠে বলেন—না বললেই পারিস? কে তোকে সেধেছে—'মামা' বলে পরিচয় দিতে?

—বাঃ! বেড়ে!...মানিক শ্লেষের হাসি হেসে বলে—এমন নইলে বুঝি! পরিচয় দেবো না তো শুধু আমার মুখখানি দেখে দোকানে পসারে কে আমাকে অম্‌নি মাল ছাড়বে শুনি?

মামী শুনে আরো জ্বলে ওঠেন। চীৎকার করে বলেন—ওরে বোম্বেটে শয়তান! মামার নাম ভাঙিয়ে বাজারে ধার করে বেড়াও তুমি?

—ধার! ধার করে বেড়াই?—মানিক যেন রীতিমত অপমানিত হয়েছে, এইভাবে বলে—ধার করে বেড়াবে এমন হুজ্জুতে ছেলে মানিকচাঁদ নয়, বুঝলে মামী? ধার করে ছোটলোকে। দস্তুর মতো শ্লিপ্ লিখে দোকানে জমা দিয়ে, তবে জিনিস

# গল্প ভালো আবার বলো

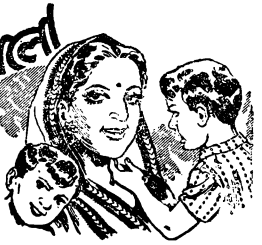

নিই! ওই জন্যেই অল্‌ওয়েজ মামার লেটার্‌ হেড্‌—মানে আর কি—মামার নাম ঠিকানা ছাপা ওই চিঠির কাগজ দু পাঁচখানা পকেটে রাখি। লণ্ড্রীতে, দর্জির দোকানে, স্টেসনারি শপে, রেষ্টুরেণ্ট কোথায় না দরকার হয়?

মামী চোখ কপালে তুলে বলেন—সেই কাগজ দেখলেই তোকে অমনি জিনিস ছেড়ে দেয়?

—না বললেই পারিস? [ পৃঃ—১০৬

—দেবে না—মানে? মানিক 'ঘুঘু-মার্কা' একটি হাসি হেসে বলে—কাগজ কি আর তখন কাগজ থাকে মামী? কাগজ নোট হয়ে যায়!

মামী রাগ ভুলে অবাক্‌ হয়ে বলেন—কাগজ নোট হয়ে যায়?

—হুঁ-র বা বা! একেবারে নোটের সেরা নোট, হ্যাণ্ড-নোট! হবে না? কাগজের নীচের দিকে মামাকে দিয়ে সই করিয়ে রাখি

# গল্প ভালো আবার বলো

যে! তাক বুঝে মামাকে একবার ধরে বসিয়ে এক সঙ্গে ডজন দুই কাগজে সই করিয়ে নিই, যে ক'দিন চলে! মাসের শেষে মামা সব ম্যানেজ করে দেয়।

কাগজ নোট হয়ে যায় শুনে মামী ভাবছিলেন ধুরন্ধর ভাগ্নে হয়তো কোথাও কোনো ম্যাজিক-ট্যাজিক শিখে এসেছে যাতে কাগজে নোট করা যায়। নোট করার ইতিহাস শুনে মামী গরম তেলে কই মাছের মতো চিড়বিড়িয়ে ওঠেন। যতো পারেন কটুকাটব্য করেন মানিককে, আর সত্যহরির উদ্দেশে 'ন ভূতো না ভবিষ্যতি' করতে থাকেন।

মানিক এ সব পছন্দ করে না, বিরক্তভাবে বলে—আঃ এক জ্বালা হয়েছে বাড়ীতে! সর্ব্বদা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ বক বক!...মানুষকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না! ভাইদের তো পেল্লায় বাড়ী আছে, যাও না সেখানে? গিয়ে থাকো গে না! মামা ভাগ্নেয় দুদিন জুড়িয়ে বাঁচি।

এরপর আর কথা কইতে প্রবৃত্তি হয় মানুষের? সত্যহরি-গিন্নী সুভাষিণীর তো হয় না। তিনি কথা বন্ধ করে দেন মানিকের সঙ্গে।...কিন্তু সে আর ক'দিন? সে প্রতিজ্ঞা ক'দিন রাখা যায়? আবার কইতে হয়। যাকে চারবেলা খেতে দিতে হবে হাতে করে, তার সঙ্গে কথা না কইলে চলে?

যেদিন ভাতের থালাটাকে দুম্ করে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যান আর কিছু নেবার কথা জিজ্ঞেস করেন না, সেদিন আঁচিয়ে উঠে মানিক মামার শ্রবণশক্তির এলাকার মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে বেশ গলা তুলে আক্ষেপ সুরু করতে থাকে—হুঁঃ। সাধে কি আর বলেছে—মামার ভাত, মামীর হাত!...রাস্তার ভিখিরিটাকে খেতে বসালেও মানুষ একবার শুধোয়—"কি রে, কিছু নিবি?" আর ভাগ্নে এমনই চক্ষুঃশূল জিনিস যে তার জন্যে সেটুকু মনুষ্যত্বও আসে না। হা ঈশ্বর!

# গল্প ভালো আবার বলো

প্রত্যেক কথায় ঈশ্বরকে ডাক দেয় বলে এ মনে করবার দরকার নেই মানিক খুব ঈশ্বর অনুরাগী!... ওটা মানিকের মুদ্রাদোষ।

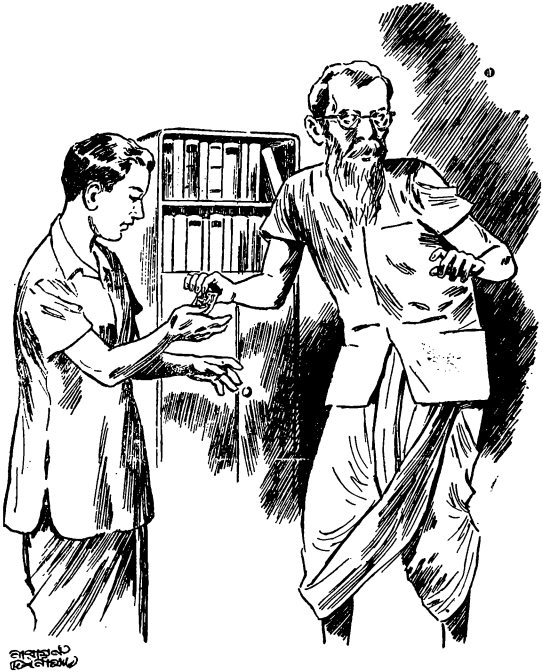

মানিকের কথা সত্যহরির কানে গেলেই সত্যহরি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মানিক তাঁর আপন বোনের ছেলে নয় বটে, পিস্‌তুতো বোনের। তা'তে কিছু এসে যায় না। বাড়ীতে থাকে, 'মামা' বলে ডাকে, অতো কি আর মনে থাকে, 'আপন নয়, আপন নয়'! আর —আপন পর যাই হোক, কারো খাওয়া ভালো হয়নি শুনলেই

অনুরোধ জানান হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে। [পৃঃ—১১০

# গল্প ভালো আবার বলো

সত্যহরি চঞ্চল না হয়ে পারেন না।...অতএব তিনি মানিককে চুপি চুপি ডেকে দ্বারিকের দোকান কি গ্রেট ঈস্টার্ণে যাবার অনুরোধ জানান হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে। চুপি চুপি না করে উপায় নেই, সুভাষিণীকে প্রায় বাঘের মতোই ভয় করেন সত্যহরি।

কিন্তু মানিক তো আর ভয় করে না? সে টাকাটা লুফ্‌তে লুফ্‌তে, অথবা নোটখানা দোলাতে দোলাতে মামীর কাছ বরাবর ঘোরা-ঘুরি করতে করতে বলে—যাই, এখন আবার রেষ্টুরেণ্ট ছুটি! নিশ্চিন্দি তো নেই! মামা গুরুজন, তার উপরোধ ঠেলাও দুষ্কর! উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, তা এতো দুটো চপ্‌ কাটলেট কি খানিক মাংস পরোটা!...তবে এও ভাবি—কী লোক কী বাড়ীতেই বিয়ে করতে গেছলো! জানি তো তেনাদের নামের মহিমা! সকালে নাম করলে অন্ন জোটে না, হাঁড়ি ফাটে। নইলে আর এমন কন্যে!

আর যায় কোথা!

প্রতিজ্ঞা ভুলে তেড়ে আসেন সুভাষিণী। সত্যি এতো অপমান সহ্য করে কে মৌনব্রত পালন করতে পারে? রীতিমত একটি খণ্ডপ্রলয় ঘটে যায়! আর মানিক অম্লান বদনে সমস্ত গালমন্দ সহ্য করে, শেষকালে দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে—ধন্য ধন্য! নাম রেখেছিলো বটে মা বাপ। যা এক একখানি ভীষণ কথা, দাপটে হিমাদ্রি টলেন!...তবে মানিক নাকি একেবারে সহ্যাদ্রি, তাই এখনো টিকে আছে!

সুভাষিণী বলেন—থাকবি না তো যাবি কোথায় শুনি? তিন কুলে আছে কেউ?

মানিক বলে—হাসালে মামী, তিনকুল কোথা? সবে তো দুটোই কুল এখনো! তবে হ্যাঁ—এক্‌খুনি গিয়ে একখানি বিয়ে করি, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুল বেড়ে যাবে!... আর শ্বশুর বাড়ীতে? কোন্‌ বেটা শ্বশুর আর জামাইকে মাংস পোলাও রাবড়ি

# বলো ভালো আবার বলো

রসগোল্লা না খাওয়াবে?...তোফাই থাকতে পারি। যাই না—শুধু মামার মায়ায় পড়ে। আমার অবর্ত্তমানে—একা তুমি মামাকে নিজের অধিকারে পেলে কি আর রাখবে?

এ অপমানের পর আবার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

এমন চলছিলো সেই বন্ধর পালা—কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে কথা বলায়। চাকরটা নেই বাড়ীতে, আর সুভাষিণী সুক্ত চড়িয়ে দেখেন পাঁচ-ফোড়ন নেই।

মানটা বরং খোওয়ানো চলে, কিন্তু সুক্ততে পাঁচ-ফোড়ন না দিলে তো আর চলে না! অন্ততঃ সুভাষিণীর মতে চলতে পারেই না। অগত্যা ছুটে আসেন মানিকের শরণাপন্ন হতে।

—ধন্য ধন্য! নাম রেখেছিলো বটে মা বাপ। [পৃঃ—১১০

# গল্প ভালো আবার বলো

সংসারের কাজে মানিককে পাওয়া যায় না অবশ্য কোনো সময়েই! মানিক হয় বাড়ীতে থাকে না, নয় খাটের ওপর বাবা ভোলানাথের ভঙ্গীতে শুয়ে পা নাচায় আর দার্শনিক-চিন্তা করে। তবু তেমন বিপদে পড়লে ধ্যানভঙ্গ করতেই হয় ওর। যেমন আজ করলেন সুভাষিণী। ছুটে এসে বললেন—আছো তো বিছানায় লম্বা হয়ে? উঃ, দেখলে যেন গায়ে বিষ ছড়ায়! নাও, অনুগ্রহ করে ওঠো দিকি একবার! চার পয়সার পাঁচফোড়ন এনে দাও, চট্ করে।

সুভাষিণী যদি এসে বলতেন—"ও বাবা মানিক, মাধাইটা বাড়ী নেই; কষ্ট করে একবারটি একটু দোকানে যা দিকি—" তাহ'লে কি হতো বলা যায় না, হয়তো মানিকের মন গলতো, কিন্তু এ ক্ষেত্রে? নৈব নৈব চ!

মানিক একবার মাত্র মামীর দিকে অভ্যস্ত তাচ্ছিল্য দৃষ্টি হেনে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুলো পাশ বালিশটাকে ভালো করে আঁকড়ে।

এমনিতেই, ঘরে ঢুকেই সুভাষিণীর মেজাজ উঠেছিলো পঞ্চমে, এখন চড়লো সপ্তমে। সাধ্যমতো চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—গুছিয়ে গাছিয়ে শুচ্ছিস্ যে? যাবি না?

মানিক ওদিক্ ফিরেই বিরক্ত ক্লান্ত স্বরে বলে—আঃ বাবা, এ সংসারে ছ'মিনিট একটু উচ্চ চিন্তা করবারও জো নেই! তিন তিন দিন সিনেমা দেখা হয়নি, কোথায় ভাবছি ছটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো, না তিনটের 'শো'তেই চলে যাবো, তখন এই ভাবনা-চিন্তার সময় কানের কাছে কামান দাগলেন, কিনা 'চার পয়সার পাঁচফোড়ন!' ছিঃ!

সুরের রাজ্যে সাতটা বৈ স্তর নেই, কিন্তু স্বরের রাজ্যে আছে। নবম দশম একাদশ দ্বাদশ—অনেক স্তর আছে। সুভাষিণীর স্বর উঠতে থাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বরে।

মাথা চুলকে বলেন—ছোঁড়াটা গেল কোথায় ?

# গল্প ভালো আবার বলো

—এতোখানি আস্পদ্দা হয়েছে তোর? আমাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য? ভেবেছিস কি তুই?

মানিক ঘাড়টা ঘুরিয়ে একচোখের কোণ দিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলে—তোমাকে তো তুচ্ছ করিনা, করি তোমার আক্কেলকে। পাঁচফোড়নের অভাবে অমন কি রাজ্য বয়ে যাচ্ছিলো যে, একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে, তা'কে জ্বালাতে এলে?

—শুয়ে রয়েছে!...স্বর চড়তে থাকে,—শুয়ে রয়েছে, তো আমার মাথা কিনেছে!... বলি—শুয়ে থাকবার সময় এটা? চব্বিশ ঘণ্টা শুয়েই বা থাকবি কেন? জোয়ান বয়সের একটা ছেলে, লজ্জা করে না খালি বিছানায় আড় হয়ে পড়ে থাকতে? যা, দেখগে যা—এতোবড়ো পৃথিবীতে নেহাৎ অনড় রুগী ভিন্ন বেলা ন'টার সময় শুয়ে কে আছে?

...কে আছে? মানিক এবার উঠে বসে, খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বলে—হুঁ!... পৃথিবীর সব খবরই তো

...পৃথিবীর সব খবরই তো রাখো!

# গল্প ভালো আবার বলো

রাখো! পৃথিবীতে ক'জন খেটে খায়, আর ক'জন বসে খায়, তার হিসেব জানো?

সুভাষিণী গলার শির ফুলিয়ে চেঁচান—সে হিসেব তুই রাখগে যা! মামার ঘাড়ে চেপে বসে বসে চারবেলা চর্ব্বচোষ্য খেতে যার লজ্জা করে না, তারই বসে বসে ওই সব হিসেব করা সাজে!... আপনার ভাগ্নে নয়, কিছু নয়, পিসতুতো বোনের ছেলে, তাকে নিয়ে এত জ্বালা পোহানো! কেন শুনি? কেন চারবেলা খাওয়াবো, যদি একটু কাজ না পাই?

মানিক হঠাৎ—ধুত্তোর খাওয়া—বলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলে—বেশ! অতোই যখন তোমার আপন পর নিয়ে চুলচেরা হিসেব, তখন চললাম!...মামাকে ডিস্‌পেনসারিতে বলে চলে যাবো!

সত্যহরি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার! পসার আছে। ডিস্‌পেনসারি বাড়ীর কাছেই।

সুভাষিণী আর কি বলতেন কে জানে, ওদিকে ততোক্ষণে সুক্ত পুড়ে শেষ হয়ে সারাবাড়ীতে সৌরভ বিকীর্ণ করছে!...তার ভেতরেই সুভাষিণী একবার প্রশ্ন করেন, কোথায় যাওয়াটা হচ্ছে শুনি?

—যে দিকে দু চোখ যায়!

খানিক পরেই সত্যহরি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। কিন্তু সুভাষিণীকে প্রশ্ন করেন ভয়ে ভয়ে।

মাথা চুলকে বলেন—ছোঁড়াটা গেলো কোথায়?

সুভাষিণীর সুক্তো পুড়েছে, রান্নাঘর খোলা পাওয়ার সুযোগে বেড়ালে দুধ খেয়ে গেছে, কাজেই মেজাজ খাপ্‌পা! তিনি রক্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—কেন, তোমাকে তো বলে গেছে!

—হ্যাঁ—অ্যাঁ! ইয়ে কি একটা বলে গেলো—'জন্মের শোধ চলে যাচ্ছি' না কি! ঠিক বুঝতে—

# গল্প ভালো আবার বলো

—বলেছে তাই? সুভাষিণী বলেন—আজই পাঁচসিকের হরির লুট্ দেবো, মেনে রেখেছিলাম!

—মানে? মানে? ব্যাপারটা কি হলো?

—হবে আবার কি! মান্‌কে বিদেয় হলে হরির লুট্ দেবো, মেনে রেখেছিলাম!

—আহা ছি ছি!

—ছি ছি মানে? সুভাষিণী আরও চটিতং হয়ে বলেন—ও হতভাগা বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে, আর তাই তুমি সহ্য করবে?

সত্যহরির দাড়ি আছে। তিনি সভয়ে একবার সেই দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—কই না তো! দাড়ি তো এই—

—বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! সত্যি করে ঘাস ওপড়ানোর মতন টেনে না ওপড়ালে বুঝি আর চৈতন্য হবে না? বলি মান্‌কে তোমার নিজের বোনের ছেলে?

সত্যহরি প্রতিবাদ করে ওঠেন—কে বলেছে, কে? মান্‌কের মা আমার মেজপিসির মেয়ে না?

—আর মান্‌কে সেই মামাতো মামার বাড়ী বসে রামরাজত্ব করবে?

সত্যহরি আরো তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন—কখনো না, কেন করবে?

—করবে না কেন? তুমি যেমন বোকা!

—আমি বোকা? বটে! বলেছে বুঝি মান্‌কে?

—শুধু মান্‌কে বলবে কেন, জগৎ সুদ্ধু সবাই বলবে। মান্‌কে তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে কী লাট-সাহেবীটা চালায় দেখেছো তাকিয়ে?

সত্যহরি চোখ পাকিয়ে বলেন—দেখিনি আবার? শুধু লাট-সাহেবী? স্রেফ নবাবী! বেটার চেহারাখানাও কি তেমনি! আদ্দির পাঞ্জাবী উড়িয়ে আর লম্বা কোঁচা দুলিয়ে যখন আমার ডিস্‌পেনসারির সাম্‌নে দিয়ে যায়, মনে হয় টেবিলের

# গল্প ভালো আবার বলো

তলায় লুকিয়ে পড়ি। কে বলবে যে আমি ও বেটার মামা! ঠিক যেন ওর বাবার বাড়ীর চাকর!

—বেশ বলেছো! সুভাষিণী ধিক্কারের স্বরে বলেন —তাইতেই ও আমাকে অতো তাচ্ছিল্য করে।

—তোমায় তাচ্ছিল্য করে? বটে? এতো আস্পদ্দা হয়েছে ওর? কি বলে কি?

—কি না বলে?—আমার একটা কথা শোনে না, আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে, আমাকে বাপেরবাড়ী তুলে খোঁটা দেয়।

—বটে! বটে! এই সব করে মান্‌কে? সহ্য করবো না। এসব সহ্য করবো না আমি! সায়েস্তা করে দেব ওকে। বাপের-বাড়ী তুলে খোঁটা?...না না চলবে না, এসব চলবে না।

সত্যহরি বীরবিক্রমে দালানে যেন নেচে বেড়ান।

সন্ধ্যাবেলা মাধাই এসে বলে—বাবু, দাদাবাবু "সুখাদ্য রেষ্টুরেণ্টে" বসে খাচ্ছে, টাকা চাইলো!

কই না তো! দাড়ি তো এই— [পৃঃ—১১৫

# গল্প ভালো আবার বলো

সুভাষিণী হতবাক্ হয়ে বলেন—টাকা চাইলো!

মাধাই দাদাবাবুর অনুরক্ত, সে বিরক্ত স্বরে বলে—না চাইবে তো পাবে কোথায়? দাদাবাবু কি রোজগার করে?

সত্যহরি বীরবিক্রমে দালানে যেন নেচে বেড়ান। [পৃঃ—১১৬

—যে রোজগার করে না তার আবার এতো হোটেলে খাওয়ার সখ কেন রে মুখপোড়া?

মাধাই গম্ভীরভাবে বলে—তা' কি করবে? আপনি ইদিকে ভাতের খোঁটা দিয়ে বসে আছো, খাবে কি? দাদাবাবু বলেছে এ জন্মে ভাত খাবে না! শুধু চপ কাটলেট মাংস পরোটা, রাবড়ি ডালপুরী খেয়ে থাকবে!

সুভাষিণী সত্যহরির দিকে চেয়ে জ্বলন্ত স্বরে বলেন—শুনছো!

—শুনছি বলে, শুনছি! শুনে শুনে তাজ্জব বনে যাচ্ছি! বাঙালীর ছেলে তুই, গোঁ করে ভাত ছেড়ে

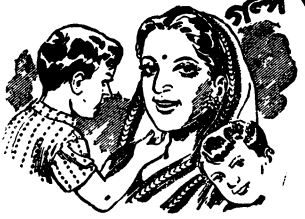

# গল্প ভালো আবার বলো

দিবি? বলি, ছেড়ে দিয়ে বাঁচবি? আমার আর একটি রুগী বাড়াবে আর কি!

সুভাষিণী হতাশ ভাবে বলেন—আমারও যেমন, তাই তোমাকে কথা বলতে আসি।

—কতো টাকা দিচ্ছো?

সত্যহরি অপ্রতিভ ভাবে বলেন—ইয়ে মানে গোটা চারেক টাকা না দিলে কি? মানে সকাল থেকে খায়নি—

ততোক্ষণে মাধাই হেসে ওঠে—চার টাকায় কি হবে বাবু? দাদাবাবু বলে দিলো অন্ততঃ দশ টাকা চাই! চার পাঁচ জনা বন্ধু মিলে খেতে বসেছে!

সুভাষিণী ছিটকে ওঠেন—বটে! নিজে খেয়ে হয় না, আবার বন্ধু নিয়ে খেতে বসা হয়েছে!

এমন যে কতোই হয় এবং ডিস্‌পেনসারি থেকে তার বিল মেটানোর টাকা যায়, সে সুভাষিণী জানেন না। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা শেষ করেন—পরের ঘাড়ে চড়ে হচ্ছে, তাই। নিজের পয়সা হতো, তো দেখতাম, কতো দরাজ মন। দেখবো—মরবো না তো? নিজের পয়সা হলে তখন হাত দিয়ে জল গলবে না।

যাই হোক—রেষ্টুরেণ্টের দশটাকা তবুও সহ্য করেছিলেন সুভাষিণী। ছেলেটা সকাল থেকে ভাত খায়নি বলে তবুও মনটা একটু নরম হয়েছিলো ভিতরে ভিতরে। কিন্তু যখন মাধাই এসে বললে—বাবু, দাদাবাবু বললো, আর পাঁচটা টাকা লাগবে দুই বন্ধুতে সিনেমা যাবে—তখন সুভাষিণী গম্ভীর ভাবে বললেন—মাধাই, তুই একটা রিকশা ডেকে দিয়ে যা, আমি বাপের বাড়ী যাবো।

কিন্তু সত্যহরি নিজেই এবার রেগেছেন।

তিনি আবার নাচতে থাকেন—দেবো না টাকা। কেন দেবো? হেস্তনেস্ত

করবো, এর একটা হেস্তনেস্ত করবো! দু'হাতে টাকা ওড়াবে? ভেবেছে কি? না না, কিছুতেই দেবো না! ওকে সায়েস্তা করবো।

মাধাই বলে—সে যখন যা করবেন, করবেন বাবু। আজ দাদাবাবুর মনটা খিঁচড়ে আছে, সিনেমা না দেখলে মন ভালো হবে না।

সত্যহরি একখানা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—বলগে যা, এই শেষ! "সিনেমা না দেখলে মন ভালো হবে না!" উঃ! এই সিনেমাগুলোয় কবে আগুন লাগবে!

ব্যস্ তারপর থেকে সত্যহরি মানিককে জব্দ করবার তালে ঘোরাঘুরি করেছেন, আর সুভাষিণী মৌন ব্রত নিয়ে বসে আছেন।

দিন তিনেক পরে হঠাৎ মানিক এসে হাজির। ট্যাকসি থেকে নামলো, পিছনে সত্যহরি।

সুভাষিণী গম্ভীর ভাবে ওর আপাদমস্তক দেখে নেন, সেই ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি, কায়দার টেরী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে এসেন্সের গন্ধ—দেখে আবার গা জ্বলে উঠলো সুভাষিণীর। বললেন—কেন, বন্ধুর বাড়ী আর জায়গা হলো না বুঝি? আবার এলি যে?

মানিক মুচকে হেসে পাথার স্পীডটা পুরোদমে বাড়িয়ে দিলো, কথা বললো না। কথা বললেন সত্যহরি—আসবে না মানে? ওর ঘাড় আসবে। আসতে বাধ্য! এ বাড়ী এখন কার? ওর নয়? দায়িত্ব নেই ওর! একেবারে জন্মের শোধ জব্দ করে দিয়েছি। বাড়ী-ডিস্‌পেনসারি, দেশের জমিজমা নগদ টাকা যেখানে যা ছিলো, সব চাপিয়ে দিয়েছি হতভাগার ঘাড়ে। একেবারে পাকা উইল। নে এখন কি করবি কর! এখন ওড়াও দু'হাতে! হুঁ বাবা, তা' আর ওড়াতে হবে না। এ আর পরের

# গল্প ভালো আবার বলো

পয়সা নয়, দস্তুর মতো নিজের গ্যাঁটের জিনিষ। এরপর হাত দিয়ে জল গলবে না! দেখবো সবই, মরবো না তো!

সুভাষিণী ভীষণ স্বরে বলেন—তুমি না মরো আমি মরবো। গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। মান্‌কের পয়সায় খেয়ে বেঁচে থাকার চাইতে—

মানিক কথায় বাধা দিয়ে বলে—আঃ কেন মামার কথা ধরছো মামী? 'ঘাড়ে চাপাবে!' ঘাড় ভারী সস্তা, চাপালেই হলো! ঘাড়টা পাতছে কে?...বাকে বক্‌ বক্‌ ছেড়ে এখন কিছু টাকা খসাও দিকি মামা, জুত করে একটা সিনেমা দেখে আসি!...মামী যাবে না কি? যাবে তো বলো? দুটো টিকিট কেটে আনি তা'হলে!

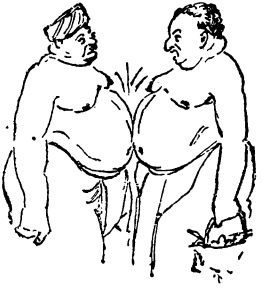

# বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

স্কুল ফাইন্যাল হয়ে গেলো! আর বিমলকে পায় কে? এবারে নিশ্চয় সে একা একা কোথাও বেড়াতে যাবে। আর তো সে নাবালক নেই! 'এবার আমি একা একা রেলে চড়ে বেড়াতে যাবো—' আপন মনে চীৎকার করে বলে উঠলো বিমল।

বিমলের মা কাজ করতে করতে চমকে উঠে বললেন, 'চে'চাচ্ছিস কেন?'

'বলছি, আমি একলা রেলে চড়ে বেড়াতে যাবো।'

'আহা কতো বীরপুরুষ!'

'মানে?' বিমল চোখ গোল্লা করে বলে, 'পারি না ভাবছো?'

মা হেসে বললেন, 'তাই তো ভাবছি।'

'হুঃ, তোমাদের যতো অবিশ্বাস! দেখিয়ে দেবো—দেখো না। আমার এক বন্ধুর ঘাটশিলায় মামার বাড়ী, ওর সঙ্গে—'

কথা শেষ না হতেই ওদিক থেকে বিমলের কাকা আঁৎকে উঠে বলে উঠলেন —'কি বললি, ঘাটশিলা? কেন ওই সাপের আড্ডা ছাড়া আর জায়গা নেই ভারতবর্ষে?'

# গল্প ভালো আবার বলো

'সাপের আড্ডা?'

এবারে আঁৎকে উঠলেন মা। 'তাই না কি? ঘাটশিলায় সাপের আড্ডা?'

'না তো কি? সরকারি হিসেবের খাতা খুলে দেখো গে বৌদি, দেখবে মানুষ পিছু তিনটে করে সাপ ওখানে!'

'মানুষ পিছু' কথাটার মানে বুঝতে না পেরে মা শিউরে উঠে কাঁদো কাঁদো হলেন—'অ্যাঁ! বলো কি ঠাকুরপো, প্রত্যেকটা মানুষের পিছু পিছু তিন তিনটে করে সাপ বেড়ায়? এমন দেশ তো কখনো শুনিনি ভাই।'

বিমল হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—কাকা, কি বাজে বাজে কথা বলছো? ঘাটশিলায় তপনের মামার বাড়ী তা জানো?'

'আ রে বা বা তোমার তপন স্বপন

বিমল হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো,

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

যাই হোক, সরকারি খাতা হচ্ছে সরকারি খাতা! ওতে তো আর ভুল হতে পারে না।'

বিমল একগুঁয়ের মতো বললো, 'ওসব জানি না, আমি যাবোই।'

বিমলের মা বিমলের বাবার কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'দেখো তুমি, বিমল সাপের দেশে বেড়াতে যেতে চাইছে।'

'সাপের দেশ? সেটা আবার কি বস্তু?'

'আহা তুমি যেন কিছুই জানো না। ঠাকুরপো বলেছে ঘাট-শিলায় মানুষ পিছু তিনটে করে সাপ।'

শুনে বিমলের বাবা তো চমৎকৃত!

যাই হোক ছেলেকে ডেকে

শুনে বিমলের বাবা তো চমৎকৃত!

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

তিনি জিজ্ঞেসবাদ করে সব জানলেন। আর মাথা নেড়ে বললেন, 'সাপ হোক না হোক, আমাদের ছেড়ে একলা—'

বিমল একগুঁয়ের মতো বলে উঠলো, 'আমি ওসব জানিনা, আমি যাবোই। এখনো বুঝি খোকা আছি? দু'মাস পরেই তো কলেজে ভর্ত্তি হবো।'

এতো বড়ো অকাট্য যুক্তির পর আর কি কথা চলে? অতএব বিমল সুটকেস গোছাতে সুরু করলো। তবু পাঁচজনের পাঁচকথার জ্বালায় যাবার সময় তপনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে ওখানে না কি ঘরে-বাড়ীতে-পথে-ঘাটে হরদম সাপ ঘুরে বেড়ায়?'

তপন হেসে উঠে বলে,

তপন হেসে উঠে বলে, 'হ্যাঁ বেড়ায়। তোর নাকের ওপর উঠে এসে বসবে। [পৃঃ—১২৫

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

'হ্যাঁ বেড়ায়। তোর নাকের ওপর উঠে এসে বসবে। তবে হ্যাঁ, সাপখোপ একটু আছে বটে ওখানে। সন্ধ্যের পর বাগানে বা লনে-টনে না বেড়ানোই ভালো।'

দুপুরের গাড়ী।

সন্ধ্যের দিকে পেঁছে গেলো ওরা।

বিমল এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো—'হ্যাঁ রে লাইট নেই এখানে?'

তপন বললো—'না তো! লাইট আবার কই!'

তাইতো!

বিমলের একটু ভাবনা ধরে গেলো। একে সাপের দেশ, তাতে আবার লাইট নেই!

তপনের মামা মামী আর মামাতো ভাইবোনেরা কিন্তু বেজায় খুশি। বিদেশে পড়ে থাকেন, কলকাতার বন্ধু-টন্ধু এলে ওঁদের যেন উৎসব লেগে যায়।

কতো কি যে রান্না করলেন মামীমা তার ঠিক নেই। আর কী হাসি-খুশি করে খাওয়া!

বিমল রাক্ষসের মতো চীৎকার করে উঠলো 'আঁ-আঁআঁ!' [পৃঃ—১২৬

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

খাওয়ার আমোদে মানুষ পিছু তিনটে সাপের কথা ভুলেই গেলো বিমল।

কিন্তু হায় ভগবান্!

সর্পাঘাত যার কপালে রয়েছে, কে তাকে ঠেকায়! আঁচাতে গিয়ে উঠোনে নামতেই সাপ! পায়ের ওপর দিয়ে সড়াৎ করে সরে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে বিমল রাক্ষসের মতো চীৎকার করে উঠলো 'আঁ-আঁআঁ!'

সকলে হাঁ—হাঁ হাঁ করে উঠলো 'কি হলো? কি হলো?'

বিমল ছুটে দালানে উঠে এসে বসে পড়ে ভাঙা কাঁসরের মতো ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'সা—আ—প্।'

সাপ!!

'সাপ কি? সাপ কোথায়?'

'ওখানে! কা—কা—কামড়ে দিয়েছে—!'

ন্যাতার মতো নেতিয়ে শুয়ে পড়লো বিমল, আর মাটিতে মুখ গুঁজে গোঁ গোঁ করতে লাগলো! মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে, আর সন্দেহের কি আছে?

হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো তপন, 'ও মামা, কি হবে? বিমলের মাকে আমি কি বলবো? ওঁরা যে এই ভয়ই করেছিলেন! আমি কি বলবো মামা! আমি কি বলবো!'

আর কি বলবে! যা হবার তা'তো হয়েই গেলো দেখা যাচ্ছে। তপনের মামা মামী দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি সুরু করে দিলেন। শোনা আছে—সাপে কামড়ালে বাঁধতে হয়, তপনের মামা ওদেরই বিছানা বাঁধা দড়িটা দিয়ে বিমলের দুটো পা কসে কসে বেঁধে দিলেন। দুটো পা-ই কেন তাই বলছো তোমরা? তা' ছাড়া আর করবেন কি? বিমলের কি আর বলবার ক্ষমতা আছে কোন্ পায়ে কামড়েছে? ও তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

'মামা, রোজা?' তপন চীৎকার করে উঠলো—'রোজা নেই এখানে?'

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

রোজা! হয়তো আছে, কিন্তু তপনের মামা তো জানেন না কোথায় আছে।

তপন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'এতোদিন আছো এখানে, রোজার ঠিকানা জানো না?'

'কি করে জানবো বাবা! কখনো তো সাপে কামড়ায় নি!'

তাছাড়া—!

তাছাড়া প্রধান কথা যাবেন কোথা দিয়ে? উঠোনেই যে সাপ!

বিমল ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

তপনের মামী চেঁচিয়ে উঠলেন 'ছাতে উঠে চেঁচাও!'

ও, তাও তো বটে। এ তো মনে আসেনি।

তপনের মামা তীরবেগে ছাতে উঠে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারমুখো হয়ে ডাক দিতে লাগলেন, 'ও মশাই অমুকবাবু, শুনছেন! একটা রোজা ডেকে দিতে পারেন? রোজা?'

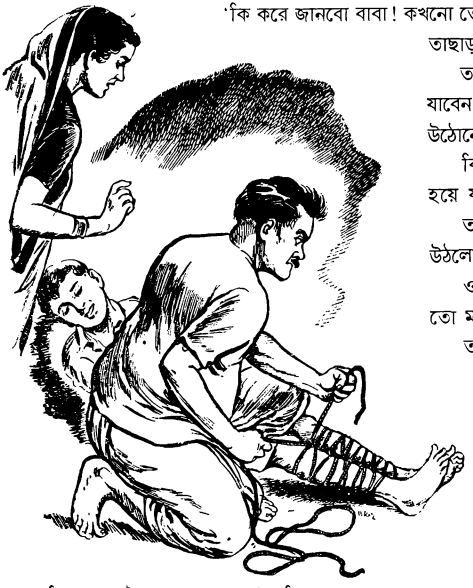

বিমলের দুটো পা কসে কসে বেঁধে দিলেন। । পৃঃ—১২৬

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

# গল্প ভালো আবার বলো

ডাকাডাকিতে কাজ হলো—চারদিকের বাড়ী থেকে সাড়া এলো, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে?'

তপনের মামা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনা বললেন।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা লাঠি সোঁটা বল্লম কাটারি আলো সব কিছু নিয়ে বুট জুতো-টুতো পরে এসে হাজির হলেন। আর সকলে ঝুঁকে পড়লেন বিমলের ওপর।

'একেবারে মারা গেছে? একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে মনে হচ্ছে কিন্তু।'

'কি করে কামড়ালো?'

'কাদের ছেলে?'

'আরো কসে বাঁধলে হতো না?'

ইত্যবসরে একজন করিৎকর্ম্মা ভদ্রলোক এক রোজা এনে হাজির করে ফেলেছেন।

রোজা এসেই ভিড় তাড়ালো। আলো ধরে নিরীক্ষণ করে দেখে দেখে বললো, 'কামড়েছে কোথায়?'

'তা তো জানি না, বোধ হয় পায়ে।'

'বাঁধলে কে?'

তপনের মামা সগর্ব্বে বললেন, 'আমি।'

'হুঁ। এ যা বাঁধন পড়েছে, তিনদিন পা নাড়তে পারবে না।' বলে বাঁধনটা খুলে দিলো লোকটা। বললো, 'দু'একটা লঙ্কা আর একটা দেশলাই দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে সাতজনের পকেট থেকে সাতটা দেশলাই বেরোলো, ভাঁড়ার ঘর থেকে এক মুঠো লঙ্কা!

একটা লঙ্কার আগা পুড়িয়ে নিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলে নাকের আগায় ধরতেই মৃত বিমল 'হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো' করে হাঁচতে সুরু করলো!

বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! হৈ হৈ করে উঠলো সবাই।

● বাপ্‌রে বাপ, বেজায় সাপ!

হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করতে করতে বিমল উঠে বসলো,

# গল্প ভালো আবার বলো

রোজা গম্ভীর ভাবে বললো, 'বাঁচবে না কেন? সাপে তো মোটে কাটেইনি ওকে।'

'সাপে কাটেনি?'

'না! বেঁধে কসে ছেলেটাকে ঠাণ্ডা মেরে আনছিলো। এই খোকা ওঠ্। কোথায় সাপ দেখিয়ে দিবি আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার লঙ্কার ধোঁয়া।

হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করতে করতে বিমল উঠে বসলো। চারিদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি মরিনি?'

'না!'

'আমি বেঁচে আছি?'

'হ্যাঁ!'

'আমায় সাপে কামড়ায় নি?'

'মোটেই না!'

'তবে কিসে ছোবল দিলো?'

রোজা ততক্ষণে আলো ধরে উঠোনে নেমেছে।

গম্ভীর ভাবে বললো, 'ছোবল দিয়েছে লাউডগা। এই যে দেখো।'

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, উঠোনের মাচায় লাউ গাছ হয়েছিলো, আর তারই একটা ডগা লতিয়ে মাটিতে পড়েছিলো। বিমল তার ওপর পা ফেলতেই ডগাটা নড়ে উঠে পায়ের ওপর দিয়ে সড়াৎ করে সরে গেছলো!

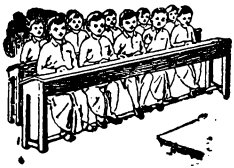

# মানুষের গল্প

আমাদের বড়ো মেসোমশাই যেন গল্পের ঝুলি। কতো গল্প যে তাঁর পেটকে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মেসোমশাই বেড়াতে এলেই আমাদের মধ্যে রীতি-মত উৎসব পড়ে যায়।

'গল্প! গল্প! মেসোমশাই, গল্প!' ছেঁকে ধরি আমরা।

মেসোমশাই হেসে বলেন, 'গল্প বলে বলে তো ফতুর হয়ে গেছি। আর গল্প কোথা?'

আমরা অতো সহজে হার মানি না। পাঁচ জনে মিলে ছোট ছেলেদের "জট নড়ে তেঁতুল পড়ে"র মতো সবেগে মাথা নাড়ি আর বলি, 'ওসব জানি না! গল্প না শুনে ছাড়ছি না।'

'না শুনে ছাড়ছই না!—আমি বললে তো?' মেসোমশাই মিটিমিটি হাসেন। এ হাসি আমরা চিনি, এ হচ্ছে গল্পের পূর্ব্বসূচনা। এ হাসি মানেই মেসোমশাই মনে মনে গল্প ভাঁজছেন। কাজেই আমরা পূর্ণোদ্যমে চেঁচাই, 'বলতেই হবে। বলতেই হবে!'

'বলতেই হবে? তা'হলে হবে। কি গল্প চাই? ভূতের?'

'যা'হোক! মোট কথা ভীষণ ভালো হওয়া চাই।' আমরা চারজনে বলি এ

# গল্প ভালো আবার বলো

কথা। কিন্তু ক্ষুদে ঘেঁটুচন্দ্র চুপিচুপি বলে, 'ভূতের গল্পয় কী দরকার রে? মেসোমশাইকে বল না মানুষের গল্পই বলুন।'

মেসোমশাই পাকা ভুরু নাচিয়ে বলেন, 'ঘেঁটু যেন কি ষড়যন্ত্র করছে মনে হচ্ছে।'

আমরা সমস্বরে বলি, 'ও বলছে ভূতের গল্পে ওর ভয় করে, মানুষের গল্পই বলুন।'

'মানুষের গল্প?' মেসোমশাই আর একবার হেসে ওঠেন, 'মানুষ কি আর এতো সস্তা জিনিষ রে, বাপু, যে চট্ করে তা'র গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে? ওর জন্যে ইতিহাসের পাতা ঘাঁটতে হয়। ভূতের গল্প বরং অনেক সোজা। তাই জন্যেই তো এখনকার লেখকেরা যতো ভূতের আর অদ্ভুতেদের নিয়ে গল্প লেখে, বুঝলি?'

আমরা অতো বাজে কথা শুনতে চাই না, মেসোমশাইয়ের কাঁধ, হাত আর পকেট ধরে ঝুলে পড়ি, 'হোক্ গে! ওসব জানি না, গল্প বলুন তাড়াতাড়ি। মানুষের গল্প।'

মেসোমশাই নড়েচড়ে ব'সে, পানের কৌটোটি খুলে সুরু করেন, 'আচ্ছা তা'হলে শোন, হ্যাঁ, মানুষের গল্পই বলি শোনঃ

'আমাদের গ্রামের রাঘব চাটুয্যে ছিলেন সাংঘাতিক লোক। যেমন বদ্‌মেজাজী তেমনি দাম্ভিক। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁর ভয়ে থরহরি কম্প।'

ঘেঁটু চোখ পিটপিটিয়ে বলে, 'বদমাইস মানুষের গল্প বলছেন বুঝি মেসোমশাই?' আমরা নেপথ্যে ধমকে উঠি ওকে, 'থাম না! শোন না চুপ করে!'

মেসোমশাই কিন্তু আপন মনে বলেই চলেন,—'তাঁর দম্ভের কথা যদি শুনিস তাজ্জব হয়ে যাবি। গ্রামে ভোর থেকে বেলা দশটা পর্য্যন্ত কারো জুতো পায়ে দেবার হুকুম ছিলো না! কেন? না রাঘব চাটুয্যে ভোরবেলায় গঙ্গাস্নানে যান। তিন ক্রোশ

# গল্প ভালো আবার বলো

দূরে গঙ্গা; হেঁটে যাবেন, হেঁটে ফিরবেন খালি পায়ে! তাঁর ফিরতে প্রায় দশটাই বাজতো।'

অবাক্ হয়ে বলি, 'তার সঙ্গে অন্য লোকের জুতো পরার কি?'

'আহা, বুঝলি না? তাঁর মতে হচ্ছে, তিনি যতোক্ষণ খালি পায়ে থাকবেন ততোক্ষণ আর কারো জুতো পায়ে দেওয়া বেয়াদপি। অতএব এই হুকুম।'

'কী আবদার! নিজে তো জমিদার, হেঁটে যাবার দরকার কি? পাল্কী চড়লেই পারতেন।'

'সে ওঁর খেয়াল। মা গঙ্গার কাছে নম্র ভাবে যাবেন। তাই বলে প্রজাদের কাছে তো আর নম্র হতে পারেন না? এই হচ্ছে কথা। একদিন একটা ছেলে, মানে দেশেরই ছেলে তবে কলকাতায় মামার বাড়ী থাকতো, ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলো। সহুরে মেজাজ তার। সে করেছে কি, একদিন সক্কাল বেলা ইয়া এক বুটজুতো পরে খটমট করে চলেছে রাস্তায়। জমিদার-বাড়ীরই সামনের রাস্তায়। ভাবখানা যেন, দেখি না কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়!

ব্যস্! পড়বি তো পড় রাঘব চাটুয্যের চোখে।

হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, খালি পা, পরনে গরদের ধুতি-চাদর, মন্ত্রপাঠ করতে করতে আসছেন চাটুয্যে। ব্যাপার দেখে একবার থমকে দাঁড়ালেন, তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তেই বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

ছেলেটা বীরদর্পে আশেপাশে-লুকিয়ে-থাকা বন্ধুদের কাছে এসে বললো, "দেখলি? কি ঘোড়ার ডিম হলো? তোরা সব ভয়েই মরে যাবি তার কি হবে? সাহস করে করতে পারলে যা খুসি করা যায়।" আর সব বন্ধুরা সত্যি অবাক্! ওরা ভেবেছিলো হয়তো বা হাতের ঘটিটা ছুঁড়েই একে ঠাণ্ডা করে দেবেন রাঘব চাটুয্যে। কিছুই হলো না। একটা ধমক পর্য্যন্ত না!

"হুঁ, বাবা, অতো সোজা নয়।" ছেলেটা বলে।

# গল্প ভালো আবার বলো

কিন্তু খানিক পরে জমিদারের কাছারিতে তলব পড়লো। ছেলে তো ছেলে—ছেলের বাপের শুদ্ধু। বাপের মুখ শুকিয়ে আমসি, ছেলে তখনো তড়পাচ্ছে, —'কি হবে? কচুপোড়া! আমি চোট্‌পাট্‌ শুনিয়ে দিয়ে আসবো, দেখো সবাই!'

তা দেখলো সবাই। একটা দৃশ্য দেখলো।

দেখার মতোই দৃশ্য।

সেই বুট জুতো দুটোর মধ্যে পায়ের বদলে হাতের চেটো দুটো পুরে রাস্তায় হামা দিচ্ছে ছোঁড়া, আর সাত হাত অন্তর মেপে তিন হাত নাকেখৎ দিচ্ছে! সঙ্গে দু'পাশে দুই পাইক। এক ক্রোশ রাস্তা ওই ভাবে নাকে-খৎ দিতে দিতে যেতে হলো।

রাঘব চাটুয্যে নাকি না-ধমক না-বকুনি, হেসে হেসে খোসমেজাজে বলে-ছিলেন তার বাপকে, "ওহে, শুনছো, তোমার

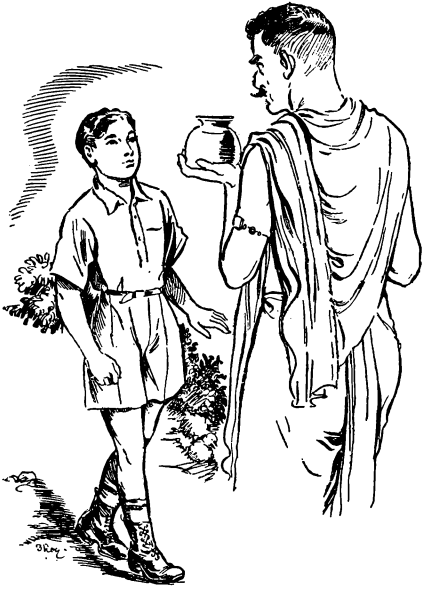

ব্যাপার দেখে একবার থমকে দাঁড়ালেন রাঘব চাটুয্যে

[ পৃঃ—১৩২

# গল্প ভালো আবার বলো

ছেলেটির জুতো দু'খানা বড়ো খাসা তো! দিব্যি নতুন ধরণের! কি বলে ওকে?"

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলে উঠেছে, "বুট।"

বলেই ভাবছে যদি জিজ্ঞেস করেন কলকাতার কোন্ দোকান থেকে কেনা, একটা বিলিতি দোকানের নাম করে দেবে চট্‌পট্। চাটুয্যে কিন্তু সে দিক্ দিয়ে যান না। তিনি তেমনি হেসে হেসে বলেন, "হুঃ! তাই! তা বাপু, তোমার এই নতুন চালের জুতো পরে অমন পুরোনো চালে হাঁটা তো ঠিক নয়! আমার এই পাইক দু'টোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো দিকি একবার! এরা নতুন চালের হাঁটন শিখিয়ে দেবে।"

নাকেখৎ দিতে দিতে যেতে হলো। । পৃঃ—১৩৩

সঙ্গে সঙ্গে দুই পাইক বিছুটির ডাল হাতে নিয়ে তৈরী। পরের কথা তো আগেই বলেছি।'

# গল্পে ভালো আবার বলো

'এ কিন্তু ভারী অন্যায়!'—আমরা বলি।

মেসোমশাই বলেন, 'অন্যায় আর ন্যায় সবই নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর। বুঝলে? এ শাসন তিনি করলে মানিয়েছিলো, আমি করতে গেলে কি আর মানাবে? না কেউ মানবেই? তাঁর কথার চালই আলাদা ছিলো।—নইলে, ধরো, জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা চলছে, পাঁচ ক্রোশ দূরে সহরে গিয়ে কোর্টে হাজির হ'তে হবে। রাঘব চাটুয্যে সেই শত্রুপক্ষকে সমানে নিজের বাড়ীতে ভাত খাইয়ে নিজের পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে কোর্টে গেছেন!'

'তার মানে?' আমরা তো অবাক্!

'মানে আর কি। বলতেন, "আমার বাড়ীতে এক প্রহর বেলাতেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈরী, আর ওরা হয়তো ভাতে ভাত গিলে কোর্টে ছুটবে! এ চলবে না।—যারা যারা সদরে যাবে সবাইয়ের জন্যে এ বাড়ীতে চাল নেওয়া হবে।" আর পাল্কী? তারও যুক্তি আছে। বলতেন, "আমার বেহারাগুলো তো হেঁটে মরবেই, আবার ওরা গরুর গাড়ী ভাড়া দেবে কেন?"

'শত্রুপক্ষ রাজী হতো?'

'ওই তো মজা! ওইখানেই মহিমা।'—মিটিমিটি হাসতে থাকেন মেসোমশাই।

'শুধু একটি শত্রুপক্ষ ছিলেন দুঁদে। আমাদের রাঙা দাদু। আমার মায়ের কাকা। একমাত্র তিনিই রাঘব চাটুয্যেকে কেয়ার করতেন না। গ্রামের লোক বলতো—সাপে নেউলে। দু'জনেই সমান শরীক্, দু'জনেই দুঁদে।

সেই রাঙা দাদুর মেয়ের, মানে পুঁটি মাসীর লাগলো বিয়ে। আমরা তখন ছোট, শুনতে লাগলাম এমন জামাই নাকি এ তল্লাটে আর কখনো কেউ করে নি। রাঘব চাটুয্যের জামাইরা এর কাছে কিসসু না।

এ পাত্র কলকাতায় থাকে, ওকালতি পড়ে, বাপের অবস্থা ভালো, দেখতে

# গল্প ভালো আবার বলো

সুপুরুষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের তখন ওসব কথায় অতো মাথাব্যথা ছিলো না, কানে আসতো এই পর্য্যন্ত। আমরা বরং মন দিয়ে শুনতাম ভোজের আয়োজন কতো দূর হবে।

দেশ বিদেশ থেকে নাকি ময়রা আনানো হবে, সাত দিন ধরে নাকি ভিয়েন হবে, লেডিকেনিগুলো নাকি বাতাবীলেবুর সাইজ আর মিহিদানার দানা সাবুদানার সাইজ হবে, এই সব। আবার নাকি লুচিও হবে। অবাক্ হয়ে তাকাচ্ছিস যে? সেকালে—আমাদের গ্রামে ঘরে অতো লুচি-টুচি ছিলো না।'

'নেমন্তন্ন-বাড়ীতেও না?'—হাঁ হয়ে প্রশ্ন করি আমরা।

মেসোমশাই মাথা নেড়ে বলেন, 'না। ভাতই চলতো। তবে কে কতো মিহি আর ভালো চাল যোগাড় করতে পারে তা'র কম্পিটিশন ছিলো বটে! ঢালাও মাছ তরকারী দই মিষ্টি আর সরু চালের ভাতই নেমন্তন্ন। লুচি? সে তো আমাদের কাছে স্বর্গীয় ব্যাপার ছিল!

তার আগে আমরা, ছোটরা, কখনো লুচি খাই নি, তাই আগামী লুচির আলোচনাতেই বিভোর থাকতাম। কে কোথায় কার শত্রুতা করতে কি কলকাটি নাড়ছে, কি ধার ধারি তা'র?

অবশেষে এলো বিয়ের দিন।

আর বলবো কি, সকাল থেকে যেন আকাশ ভেঙে নামলো বর্ষা! বর্ষাকাল, বৃষ্টি ক'দিন ধরেই চলছিলো; কিন্তু সে দিন একেবারে রীতিমত ভয়াবহ।

বড়রা সকলে বলাবলি করতে লাগলেন, "রাঘব চাটুয্যেকে আর শত্রুতা করতে হবে না, স্বয়ং ভগবান্ই নিজের হাতে সে ভারটা নিয়েছেন।"

আমরা দেখলাম, রাঙা দাদু বিপন্ন মুখে নানাদিকে ছুটোছুটি করছেন। রাঙা দিদিমা অবিরত কাঁদছেন। আমার মা-মাসীরা এবং আরো অনেক গাদা গাদা মেয়ে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেটাছেলেরা বিস্তর ডাকহাঁক করছেন। কারণ কি?

# গল্প ভালো আবার বলো

না—রাত্তিরে বৃষ্টি পড়ে আটচালার চালা ভেদ করে সমস্ত মিষ্টি নাকি ভিজে থৈ থৈ করছে!

ভেবে দেখ আমাদের মনের অবর্ণনীয় অবস্থা!

এর মধ্যে কে এসে খবর দিলো রাঘব চাটুয্যে নাকি ভোরবেলায় কোথায় ভিন্ গাঁয়ে গেছেন।

শুনে মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন রাঙা দাদু! আর কিছু নয়, নিশ্চয় পাত্র পক্ষকে ভাঙচি দিতে সদর ইষ্টিশানে গেছেন। ষ্টেশান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে এই গ্রাম। মাঝে আবার এক নদী। বালু নদী, কিন্তু বর্ষাকালে বেজায় বেড়ে ওঠে। এই পার হয়ে পরের মেয়ের বিয়ের ভাঙচি দিতে যাওয়া! বোঝ!

আবার একজন এসে বললো—বৃষ্টিতে নদীর জল নাকি হঠাৎ এতো বেড়ে গেছে যে প্রায় একূল ওকূল দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর ঘাটে একখানাও খেয়া নৌকা নেই। মাঝিরা সব নো পাত্তা!

অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!

রাঙাদাদু বসে পড়লেন। "খেয়া নৌকো নেই তো—বর বরযাত্রী আসবে কি করে?"

কি করে তা কে জানে!

বর যদি এসে না পৌঁছুতে পারে পুঁটি মাসী জন্মের শোধ খতম্। কি? কথাটার মানে বুঝতে পারছিস না? সেকালে ওই ছিলো শাস্তর। যে লগ্নে বিয়ে হবার কথা সেই লগ্নে যদি বিয়ে না হলো মেয়ের—তো সে মেয়ের আর জন্মেও বিয়ে হবে না।'

'অ্যাঁ—অ্যাঁ!'

মেসোমশাইয়ের রাঙাদাদুর মতোই 'অ্যাঁ' করে উঠি আমরা। মেসোমশাই টিপি টিপি হাসেন—'শাস্তরের তোরা দেখলি কি? সেকালে যে কতো শাস্তর ছিলো!'

সকলেই বুঝে নিলো—এ আর কারো নয়, রাঘব চাটুয্যের কাজ। যেখানে

# গল্প ভালো আবার বলো

যতো খেয়া নৌকো ছিলো সব চুরি করে বসে আছেন! বাঃ, পুকুর চুরি হয় আর নৌকো চুরি হতে পারে না?

সবই পারে। রাঘব চাটুয্যে মাঝিদের হুকুম করে দিলে তাদের সাধ্য কি যে নৌকা ঘাটে রাখে? কোথায় দূরে নিয়ে গিয়ে বালির চরায় উল্টে রেখে দিয়েছে!

নিন্দেয় হৈ হৈ পড়ে গেলো রাঘব চাটুয্যের। এতো শয়তান মানুষে হয়? ভদ্রলোকের কন্যাদায়, তখনো এই শত্রুতা? এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। নদীর জল বেড়েই চলেছে। বিকেল হয়ে গেলো, আর গোধূলি লগ্নে বিয়ে। আকাশ অবিশ্যি সারাদিনই সন্ধ্যের মতো অন্ধকার, গোধূলির কোনো মানে ছিল না। তবু শাস্তর বলে কথা! রাঙাদিদিমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, লোকে তাঁর মাথায় মুখে জল দিতেও ভুলে গেছে। আমরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছি, পুঁটি মাসী আল্‌পনা-পিঁড়ির ওপর কাঠ হয়ে বসে আছে। ওদিকে নতুন চালায় যজ্ঞির রান্না বসেছিলো, তাকে ষ্টপ্‌ করে দেওয়া হয়েছে। মাখা-ময়দার তাল আর ভাজা মাছের ঝোড়া নিয়ে বামুনগুলো হাঁড়িমুখে বসে আছে, আর আমরা সমাহিত চিত্তে জলে-কাদায় ছপ্‌ছপ্‌ করতে করতে একবার রান্না-বাড়ী একবার বার-বাড়ী আর একবার ভেতর-বাড়ী করে বেড়াচ্ছি। পান্তুয়ার গামলাগুলো জলে ভর্ত্তি, তবু ছোট ছেলেদের হাতে দেবার হুকুম নেই, এই আশ্চয্যি। দে না কেন বাবা, উঠোনে বার করে? আমরা যা পারি করি! তা' নয়!

সন্ধ্যে বোঝবার উপায় নেই, তবু এ-বাড়ী ও-বাড়ী শাঁখ বেজে ওঠার শব্দে বোঝা গেলো—সন্ধ্যা আসন্ন। আর সেই শাঁখের শব্দে হঠাৎ বিয়ে-বাড়ী সুদ্ধু চীৎকার করে কান্না উঠলো। কেন? না, হয়ে গেলো পুঁটি মাসীর দফারফা। লগ্নভ্রষ্ট হলো বলে। নদীর জল বেড়ে মাঠে উঠেছে। রাতের মধ্যেও ওপার থেকে বর এসে পৌঁছবার আর কোনো আশা নেই।

ঝড়বিষ্টি, কান্নাকাটি—সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার, আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে—হ্যাঁ

# গল্প ভালো আবার বলো

খুব মনে আছে, আর একটা প্রবল চীৎকার উঠলো। যেন পঞ্চাশটা ডাকাত পড়লো বাড়ীতে। তাদেরই চীৎকার।

না, পঞ্চাশটা ডাকাত নয়—একা রাঘব চাটুয্যের গলা। "চুপ! সব চুপ! বিয়ে-বাড়ীতে মরাকান্না তুলেছে!"

উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন রাঘব চাটুয্যে, জলে টুইটুম্বুর!

রাঘব চাটুয্যের সেই জলে শপ্‌শপে বিরাট মূর্ত্তি জীবনে ভুলবো না! সে যেন ঝড় আর বৃষ্টির একটা প্রতীক।

সেই চেহারায় কাঁধে গামছা ফেলার ভঙ্গীতে বিরাট একটা মাছ! চমকে উঠছিস? হ্যাঁ, তা আমরাও প্রথমে অমনি চমকে উঠেছিলাম। মাছটা মাছ নয় দেখে। না, মাছ নয়, জিনিষটা হচ্ছে ওই বিয়ের বর! চোখ গোল্লা করে ফেলছিস — মানে?

সেঁটে ছিলো রাঘব চাটুয্যের কাঁধে

বেগুনি রঙের বেনারসীর জোড় পরে বড়ো আহ্লাদ করে বিয়ে করতে এসেছিলেন বাছাধন! সেই জোড় ভিজে লেপটে একেবারে মাছের আঁশ। নিজেও ছোকরা প্রায় অজ্ঞান হয়ে লটপটিয়ে সেঁটে ছিলো রাঘব চাটুয্যের কাঁধে।

# গল্প ভালো আবার বলো

ব্যাপার জানবার জন্যে, বুঝতেই পারছো, তখন কী হৈ চৈ! রাঘব চাটুয্যে বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন, "সব চুপ। কথা পরে—আগে বিয়ে। ভটচায! লাগাও।"

"বরের ভিজে কাপড়?"

'থাক ভিজে! বিয়ের বর, সে এখন আবার ভিজে ছেড়ে পরবে কি? বেনারসীর জোড় তো চাই! তা ছাড়া—সময় কোথা অতো? সেই পচা শিঙিমাছের মতো ভিজে ছেলেটাকে সমানে ধরে থেকে পিঁড়ির ওপর খাড়া বসিয়ে রাখলেন রাঘব চাটুয্যে। পুঁটি মাসী তখন ঢুলছে। ভটচায সুরু করে দিলেন মন্ত্রপাঠ। আর আমরা—কলকাতার বরের দুর্গতি দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম। অবিশ্যি হাসির আরও একটা উৎসও ছিলো রান্নাবাড়ীতে।

নিভন্ত উনুনে কাঠ ঠেলে ঘিয়ের কড়া চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে এসেছি।

ব্যাপারটা কি?

পরে সবাই শুনতে পেলো।

রাঘব চাটুয্যের এক মামা মর মর শুনে, নদী পার হয়ে ভিন্‌গাঁয়ে গিয়েছিলেন চাটুয্যে, মামাকে দেখতে। যাবার সময়ই আকাশের অবস্থা দেখে ঘাটের মাঝি-গুলোকে হুকুম দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন—"সব ব্যাটারা এইবেলা ওপারে গিয়ে বসে থাক গে। ও-বাড়ীর ছোট কর্ত্তার আজ মেয়ের বিয়ে। কলকাতার বর, বরযাত্রীরা যেন এসে বিপদে না পড়ে। আর মেয়েটার বিয়ে না পণ্ড হয়।" অতএব মাঝিরা তাই গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। বোঝো, এই মানুষকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছিলো নৌকো চুরির!'

'তার পর? নৌকোগুলোর হলো কি?'

'চারখানা নৌকো বরকর্ত্তা আর বরযাত্রী বোঝাই হয়ে ওপারে আটকে বসে আছে। নদীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে কলকাতা সহরের লোকেরা কিছুতেই ছাড়তে

দিতে রাজী হচ্ছে না। সন্ধ্যেমুখো রাঘব চাটুয্যে ফিরছিলেন, ঘাটে এসে দেখেন ওই অবস্থা। পাত্রপক্ষকে অনেক মিনতি—অনেক হাতজোড় করেছেন, অভয় দিয়েছেন—এখানের মাঝিরা বিশেষ সুদক্ষ বলে, তারা কিন্তু অটল। ছেলের বিয়ে দিতে এসে কি প্রাণ খোয়াবে? মেয়ের লগ্নভ্রষ্ট হলো তো তাদের কি?

শেষ পর্য্যন্ত ধমকও দিয়েছিলেন রাঘব চাটুয্যে, তাতে তারা মহা রাগারাগি করতে সুরু করেছিলো। অতঃপর রাঘব চাটুয্যে—আচ্ছা, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি,—"দেখলাম তখন ব্যাটাদের সায়েস্তা করতে বসলে বিয়ে পণ্ড হয়। ভাবলাম, আচ্ছা, থাকো। পরে দেখাচ্ছি মজা! বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পাত্তরটাকে নিলাম নৌকো থেকে ছিনিয়ে। ব্যস্, পিঠে ফেলে সোজা সাঁতরে পাড়ি! থাক তোরা প্রাণ নিয়ে বসে, আমাদের কন্যাদায় তো উদ্ধার হোক। পেছনে চার নৌকো লোকের 'রে রে রে রে' শব্দ, আমি এদিকে জয় মা কালী বলে সাঁতরাচ্ছি প্রাণপণে, যাতে লগ্নটা না ভ্রষ্ট হয়।"

রাঙাদাদু দু'হাতে রাঘব চাটুয্যের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলেন, "দাদা, আপনি দেবতা!"

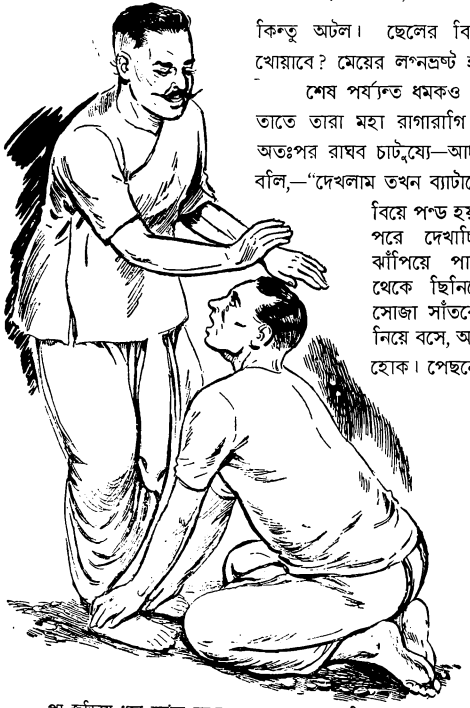

পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলেন, "দাদা, আপনি দেবতা!"

# গল্প ভালো আবার বলো

রাঘব চাটুয্যে হা হা করে হেসে উঠে বলেন, "মতলবটা কি হে? ওই ছুতোয় মামলাটা ফাঁসাতে চাও নাকি? মামলা চলবে ঠিকই, বুঝলে ছোট কর্ত্তা? এটা হলো পুঁটু মায়ের ব্যাপার! সম্পর্কে আমি ওর জ্যাঠা হই মনে রেখো!"

আশীর্ব্বাদ করতে হবে! সঙ্গে কিছু নেই। নিজের হাতের দু'টো আঙটি খুলে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করলেন রাঘব চাটুয্যে। তার পর বর যখন বাসরে বসেছে, বৃষ্টির জোর কমেছে, তখন সেই চার নৌকো বরযাত্রী এসে পৌঁছলো। তাঁরা তো অতো ভিজেও ভেজে নি, এসেছে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে। পাছে গোলমাল করে তাই দাঁড়িয়ে তদ্বির করে আর ধমকে-ধামকে সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় নিলেন রাঘব চাটুয্যে। রাত তখন ভোর হয় হয়।

রাঙাদাদু হাতজোড় করে বললেন, "দাদা, অপরাধী করে রেখে গেলেন, পুঁটির বিয়েতে এসে এক ফোঁটা মিষ্টিমুখ করলেন না?"

রাঘব ধমকে উঠলেন, "মিষ্টিমুখ? পুঁটির বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলি আমায়?"

রাঙাদাদু তো, বুঝতেই পাচ্ছো তোমরা, যাকে বলে লজ্জায় অধোবদন। বোধ করি দয়া হলো রাঘব চাটুয্যের, বললেন, "ওরে নাস্তিক ছোকরা, খেয়াল আছে সন্ধ্যের আগে থেকে এই ধুন্ধুমার চলছে? সন্ধ্যে-আহ্নিক করবার ফুরসৎ পেয়েছি? মিষ্টিমুখ, সে কালকে তখন দেখা যাবে। ওই সহুরে শয়তানগুলো যতোক্ষণ না গ্রামছাড়া হচ্ছে, নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে পারবো না। কে জানে আজকের রাগ কাল বর-কনে বিদেয়ের সময় তুলবে কিনা! সক্কাল হলেই চলে আসছি আমি।"

শুনলি তো মানুষের গল্প?'

মেসোমশাই থামতেই আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠি, 'আর আপনারা কি করলেন?—আপনারা? খেয়েছিলেন লুচি দেওয়া নেমন্তন্ন?'

মেসোমশাই হতাশভাবে দুই হাত উল্টে বলেন, 'এই দেখো, তোরা এতো বোকা! সেও কি আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয়?'

---

# মনিকোঠা

একফালি কাগজে মোড়া কোরা ধুতিখানা পড়েছিলো চৌকীর ওপর, ঘরে ঢুকেই নজরে পড়লো সুনন্দার! আর উৎফুল্ল মুখে মোড়কটা খুলে দেখতে গিয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। ছোট্ট জামা পোষাক নয়, কোরা এক-খানা ধুতি!

সবুজ ফুল পাড়!

সীতেশের নিজের অবশ্যই নয়, আদরের ভাগ্নে জিতেন চন্দরের! টিউশনির টাকাটা তাহলে আজকে পাওয়া গেছে। আর টাকাটা হাতে পেয়েই সীতেশের প্রথম মনে পড়েছে জিতুর কথা। অথচ সুনন্দা—! আচ্ছা সুনন্দার কথা থাক, কিন্তু বাচ্চু। বাচ্চুর কথাটাও একবার মনে পড়ল না সীতেশের? আজ কতোদিন ধরে বাচ্চুর জামা জুতোর অভাব জানিয়ে আসছে সুনন্দা সীতেশের কাছে! কতোদিন ধরে! এই টিউশনিটা নেওয়াই বা কার জন্যে? বাচ্চুর জন্যই নয় কি? অফিসের মাইনের টাকায় ভাতই হয়, কাপড় আর হয় না! ভাতে টান দিয়ে কাপড়, কাপড়ে টানাটানি করে ভাত, এই ভাবেই দিন চলে আসছে।

# গল্প ভালো আবার বলো

তবুও আট টাকার টিউশনি শুনে নাকি লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিলো সীতেশের। শুধু সুনন্দাই সে লজ্জাকে দাঁড়াবার-ঠাঁই দেয় নি। ঠাঁই দেয় নি, অন্য লজ্জার ছুঁচ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে।

অবশ্য সুনন্দার যুক্তিই জোরালো!

জোরালো যুক্তি আর ধারালো মন্তব্যের সাহায্যে টিউশনিটা সীতেশকে নিতে বাধ্য করিয়েছিলো সুনন্দা।

আর কথাও সত্যি! একটা মাত্র ছেলেকে—তিন বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে, যে বাপ ছেঁড়া জামা পরিয়ে রেখে দেয়, সে আবার লজ্জা কথাটা মুখে আনে কোন্ লজ্জায়? অতএব টিউশনি নিতে হয়েছিলো সীতেশকে।

তার ফলাফল এই।

প্রথম টাকাটা পেয়ে কিনা বাচ্চুর জামা জুতো খেলনা খাবার কিছু না, বুড়ো হাতী ভাগ্নের জন্যে কাপড়।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সুনন্দা।

কি কাজে ঘরে ঢুকেছিলো সে আর মনে রইলো না! সীতেশ বাড়ী এলে একটা কাণ্ড কারখানা করবেই সে। কেন, কেন সে এতো অবিচার সইবে? নিজের স্ত্রী পুত্রকেই ভালো করে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা যার নেই, তার আবার এতো মনুষ্যত্ব দেখাবার সখ কেন? আঠারো কুড়ি বছরের দাস্য ভাগ্নেকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো মনুষ্যত্ব!

বাচ্চুর যেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য তা' থেকে বাচ্চু বঞ্চিত হবে কেন? এই জিতুকে 'দি পুষতে না হতো, সেই খরচে বাচ্চুকে যে রাজার হালে রাখা যেতো? সীতেশ নন্দা, বাচ্চু নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। নিজেরা দু'জনে সমস্ত স্বার্থত্যাগ করে ছেলের যত্ন করতো তারা। কিন্তু মাঝখানে ওই এক আপদ! ওই জিতু। ওর খাওয়া পরার খরচ, ওর পড়ার খরচ।

# গল্প ভালো আবার বলো

তাও না হয় আছে, আছে, থাক! কিন্তু তাতো নয়, সীতেশের যেন সবটা প্রাণ জিতুর ওপর! মা মরা ভাগ্নের ওপর যথোচিত কর্ত্তব্য হচ্ছে না বলে বাবু যেন একেবারে লজ্জায় মরে যাচ্ছেন!

কাপড়খানা এনে রেখে ভয়ে ভয়েই চলে গিয়েছিলো সীতেশ। বুঝেছিলো সুনন্দা রেগে যাবে। কিন্তু এতোবড়ো ঝড়ের সামনে পড়বার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। চোরের মতো গুটি গুটি ঢুকছিলো সে, ওকে দেখেই সুনন্দা যেন ফেটে পড়লো। বাচ্চুর একটা বুক ছেঁড়া জামা দু'হাতে মেলে ধরে চীৎকার করে উঠলো—দেখছো? দেখতে পাচ্ছো? 'চোখ' বলে জিনিষ আছে? ঝিয়ের ছেলে মেয়েকে দেখেছো এমন জামা পরতে? বলো মুখ ফুটে? বেশ, তোমার ক্ষমতায় যখন কুলোবে না, আমিই ভার নেবো।

—'দেখছো? দেখতে পাচ্ছো?'

# গল্প ভালো আবার বলো

বাসন মাজার চাকরী নেবো, বুঝলে? বাসন মাজার চাকরী। টুঁ শব্দ করতে পাবে না! তুমি দিয়ো তোমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার আদরের ভাগ্নেকে! যাকে দিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

সীতেশ ব্যাকুলভাবে বলে—দোহাই তোমার নন্দা, জিতু যদি এসে পড়ে, শুনতে পেলে—

—পেলেতো বয়ে গেলো! মিছে কথা বলছি না আমি! কোনো সংসারে কেউ কখনো শুনেছে যে, যে-বাড়ীতে কচি ছেলের দুধ জোটেনা, সেখানে দস্যি জোয়ান একটা ছেলে বসে খায়! যেখানে বাচ্চা ছেলের গায়ের জামা হয়না, সেখানে ভাগ্নের কাপড় আগে আসে!

সীতেশ ম্লানভাবে বলে—সেদিন দেখলাম জিতু একখানা কাপড় পরেছে, একেবারে ছেঁড়া কুটিকুটি। মুখ ফুটে বলে না তো কিছু। বরং আমাদের চোখ এড়াতে ঘরের মধ্যে চারভাঁজ করে শুকোতে দিয়েছে! তাই ভাবলাম এ মাসে ওর একটা কাপড়—

সুনন্দা কিন্তু স্বামীর এই ভাবালুতা গ্রাহ্য করে না। তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে—দরদের মাত্রা বেশী থাকলেই সাধারণ জিনিষও অসাধারণ মনে হয়। ঘরে কাপড় শুকোতে দিয়েছে হাতের আলস্যে। ও কিছু বলে না বলে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে তোমার, আর যে বেচারা অবোধ শিশু বলতে জানে না,—তার কথা তোমার মনে একতিল বেঁধেনা, কেমন? তাই তার দরকারটা—হঠাৎ আবেগে আর উত্তেজনায় কথা থেমে যায় সুনন্দার। চোখ ফেটে জল আসে।

পুরুষের চোখ ফাটতে নেই। তাই শুধুই ব্যথাহত স্বরে বলে সীতেশ—যে বলতে জানে না, সে তো বুঝতে জানে না নন্দা ছেঁড়া পরায় কতো লজ্জা! কিন্তু যে জানে তার যন্ত্রণা কতো গভীর বলো তো?

—ও বুঝতে পারে না, আমি তো পারি! বোঝবার ক্ষমতা আছে তোমাদের? বলে চোখ মুছে উঠে পড়ে সুনন্দা। উঠে ট্রাঙ্ক খোলে। এ ট্রাঙ্কটার মধ্যেই তার প্রসাধনের সামান্যতম সম্বলগুলি সযত্নে রক্ষিত। সরু সুতোর মতো চিক্‌চিকে একটু

# গল্প ভালো আবার বলো

হার! সুনন্দার বিয়ের সময় ওর কাশীবাসিনী দিদিমা আশীর্ব্বাদী পাঠিয়েছিলেন! সব সোনাদানাগুলিই অভাব মিটোতে মিটোতে গেছে, শুধু এইটুকুই এ পর্য্যন্ত প্রাণ ধরে নষ্ট করতে পারেনি সুনন্দা। এবার করবে!

সরু সুতোর মতো চিক্‌চিকে একটু হার!

লুকিয়ে বেচে ফেলে, আশা মিটিয়ে কিনে আনবে বাচ্চুর জন্যে জিনিষপত্র। কি হবে তার দিদিমার স্মৃতি-চিহ্ন তুলে রেখে? যদি বাচ্চুর মুখে তুলে দিতে না পারে একখানা ভালো বিস্কুট? হাতে তুলে দিতে না পারে একটা খেল্‌না? গায়ে পরাতে না পারে দুটো সৌখীন জামা!

চেনা পাড়ায় যাওয়া যাবে না।

চেনা পাড়া নয়, নতুন পাড়া, জানা দোকান নয়, অজানা দোকান। হয়তো পাঁচ সাত টাকা ঠকাই হলো, তবু হাতে

# গল্প ভালো আবার বলো

তো এলো বাষট্টিটা টাকা! এ যে সুনন্দার কাছে রাজার ঐশ্বর্য্য!

টাকাটা নিয়ে বেশ ভারিক্কি চালে একটা জামার দোকানে গিয়ে বসলো সুনন্দা। সহজ হবার চেষ্টায় চেপে যাওয়া গলায় বললো—বছর তিনেকের ছেলের মতো সাটিনের সুট্ দেখি। বুশ্-কোটও বার করবেন—ভালো কি আছে! সাধারণ ছিটের সার্টও দেন দু'চারটে!

সারা দুপুর টহল দিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ীর দিকে পা ফেরালো সুনন্দা। ওদের নীচে তলার ভাড়াটেদের বৌয়ের কাছে ছেলেটাকে গচ্ছিত রেখে এসেছে, এতো-ক্ষণে কি করছে কে জানে! সারাদিনের ক্লান্তি তবু খুশির জোয়ারে পা চলছে জোর কদম। প্রাণ ভরেই কিনে নিয়েছে সে বাচ্চুর জিনিষ। ছটা সার্ট চারটে বুশ্‌কোট। সাটিনের সুট্, জুতো মোজা গেঞ্জি, বিস্কুটের টিন, চকোলেটের কৌটো, বড়ো রঙিন বল, আর—আর নিজের জন্যে একটা শাড়ী! ভারী লোভ হয়েছিলো

বেশ ভারিক্কি চালে জামার দোকানে গিয়ে বসলো সুনন্দা।

# গল্প ভালো আবার বলো

শাড়ীখানা দেখে। হালকা চাঁপা রঙের ওপর কালো নক্সা পাড়। অনেকদিন থেকে এমন একখানি শাড়ী পরবার লোভ ছিলো। এই শাড়ী পরে, সাটিনের সুট্-পরা বাচ্চুকে কোলে করে ওদের মামাভাগ্নেকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবে সুনন্দা! ওদের দেখিয়ে বল খেলবে খোকার সঙ্গে।

সিঁড়ির নীচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা। পৃঃ—১৫০

খুশি ঝলমলে মন নিয়ে বাড়ী ঢুকলো সুনন্দা!

এতো জিনিষপত্র নিয়ে ভাড়াটেদের ঘরে ঢোকা যায় না। ওপরে নিজেদের ঘরে রেখে এসে, তবে বাচ্চুকে নিয়ে আসবে।

সরু ইঁটপাতা সিঁড়ি! ভাঙা ভাঙা এবড়ো খেবড়ো।

যেমন ভাঙা ঝরঝরে বাড়ী, তেমনিই তো হবে! তাও যাই দাদা শ্বশুরের আমলের এটুকু আস্তানা ছিলো, তাই—রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে না। নীচের ঘর-খানা ভাড়া দিয়েও দু'পাঁচ টাকা আসছে। কিন্তু এমন সিঁড়ি যে, সে সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে দু'জনে উঠতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকে। কাজেই

● মণিকোঠা

# গল্প ভালো আবার বলো

দাঁড়িয়ে পড়তে হলো! সিঁড়ি দিয়ে জিতু উঠছে। উঠছে—আস্তে আস্তে সিঁড়ির রেলিঙ ধরে ধরে। কী আশ্চর্য্য। অমন করে উঠছে কেন জিতু, হাঁটু দুমড়ে দুমড়ে দশমিনিট ধরে! এমনি করেই ওঠে নাকি ও? কই সুনন্দা তো কোনোদিন লক্ষ্য করে নি! ওপর দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা! জিতুর পায়ের গোছ দুটো যে এমন কাঠির মতো সরু, এটাই কি কোনোদিন লক্ষ্য করেছে সুনন্দা? আর জিতুর ওই পিঠটা!

দশ বছরের ছেলের মতো সরু মাপের ছিটের সার্টপরা পিঠটা! যে ছিটের নিজস্ব রঙটা কবে বিলীন হয়ে গিয়ে, পড়ে আছে শুধু একটা রঙহীন বিবর্ণতা, আর যার পিঠের মাঝখানটা সরাসরি খানিক ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে শিরদাঁড়ার হাড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

সিঁড়ির নীচের ধাপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা, জিতু উঠে চলে গেলেও থাকে!

যেন নড়বার ক্ষমতা নেই ওর!

চুপি চুপি রান্নাঘরের কোণে নামিয়ে রাখলো প্যাকেট।

[ পৃঃ—১৫২

# গল্প ভালো আবার বলো

যেন জিতুর ছেঁড়া জামার অন্তরাল হতে উঁকি মারা তার শিরদাঁড়ার হাড়টা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে সুনন্দার মুখের উপর একটা চাবুক মেরে গেছে।

সিঁড়িতে জায়গা হয়েছে এখন, তবুও উঠতে পারলো না সুনন্দা! সিঁড়ির সামনেই যে জিতুর ঘর। এই নতুন নতুন প্যাকেটগুলো নিয়ে জিতুর ঘরের সামনে দিয়ে পার হতে হবে তো! কিন্তু জগতে একমাত্র লজ্জাহীন কি শুধু সুনন্দাই?

চোরের মতো চুপি চুপি রান্নাঘরের এক কোণে প্যাকেটগুলো নামিয়ে রাখে সুনন্দা, শুধু ওর থেকে বেছে তুলে নেয় শাড়ীর প্যাকেটটা। হালকা চাঁপা রঙের ওপর কালো ফুল পাড়ের সেই শাড়ীটা। ব্যাগ থেকে ক্যাশ-মেমোর গোছা বার করে সন্তর্পণে বেছে বার করে নেয় শাড়ীর ক্যাশ-মেমোটা।

না, কেউ দেখতে পায়নি এখনো।

চোরের মতোই চুপি চুপি ফের বেরিয়ে গেলো সুনন্দা বাড়ী থেকে। ছেঁড়া চটিটা টিপে টিপে—নিঃশব্দে!

আন্দাজে জামার মাপ ঠিক করবার মতো আন্দাজ সুনন্দার আছে।

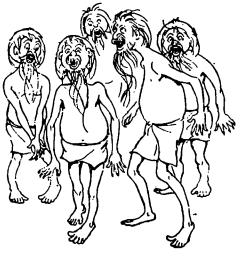

এ কাহিনীর পটভূমিকা ছিল কাশ্মীর। ভ্রাম্যমাণদের পরম দ্রষ্টব্যস্থল 'সোনে-মার্গ' পাহাড়ের ওপরে; অনেকটা উঁচুতে। প্রায় গ্লেশিয়ারের কাছাকাছি। সময়টা ছিল পড়ন্ত বিকেল।

অবশ্যি ব্যাপারটা কাশ্মীর পাহাড়ের ওপর না হয়ে যে কোন সমতলভূমির যে কোন নিভৃত কোণেও হতে পারত। কাজেই আপনারা হয়তো এখনই মুখ টিপে হেসে ভাবছেন 'ওই হ'ল সুরু—গল্পের ছলে ভ্রমণকাহিনী বা ভ্রমণকাহিনীর ছলে গল্প শুনিয়ে দেবার পাঠক ঠকানো কৌশল!' কিন্তু সত্যি বলতে হ'লে বলতে হয় আদৌ এটা গল্পই নয়! আর ভ্রমণকাহিনী তো নয়ই। এটা শুধু আমার কয়েক মিনিটের ভয়াবহ অনুভূতি, আর অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী। তবে যে কোনো কাহিনীই তো গল্প করলে গল্প!

আজীবন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপূর্ব বর্ণনা শুনে আসছি, কাজেই স্বর্গের মাশুল জোগাড় ক'রে ফেলবার সুযোগ জীবনে আসতেই একদিন স্বামীপুত্র নিয়ে দুর্গা বলে পাড়ি দিলাম সেই স্বর্গের উদ্দেশে!

# গল্প ভালো আবার বলো

শুনেছি স্বর্গে পেঁছতে হ'লেও নরক দর্শন ক'রে তবে যেতে হয়, কারণ ওইটাই নাকি পথ। ভূস্বর্গের শ্রীনগর সম্বন্ধেও বোধ করি কথাটা প্রযোজ্য। অন্ততঃ বর্ত্তমানের শ্রীনগর। অজস্র ধুলোময়লা, অজস্র নোংরা ভিখিরি, অজস্র দোকান আর অজস্র গাড়ীতে গুলজার শ্রীনগরের নরককুণ্ডে আস্তানা গেড়ে আমরা যথারীতি সরকারি বাসে চড়ে দিকে দিকে স্বর্গদর্শন ক'রে বেড়াতে লাগলাম।

অবশ্য দীর্ঘপথ অতিক্রমের ক্লান্তি সার্থক হয় নি, একথা বললে অন্যায় হবে। হয় তো বা সার্থকের ওপরেও কিছু হয়েছে। কিন্তু পথ আর পথের শেষের অপূর্ব্ব অনুভূতির বর্ণনা আমি করতে বসি নি, বর্ণনা করতে বসি নি—হিম পাহাড় আর দুরন্ত ঝরণা, সবুজ মখমল বিছানো উপত্যকাভূমি, আর ঘন-সবুজ কার্পেট পাতা 'সিঁড়ি ক্ষেত', মাথা উঁচু চেনার গাছ আর ঝাঁকড়া মাথা আপেল গাছ, চিরপ্রসিদ্ধ ঝিলাম আর চিরচেনা 'ডাল' লেকের। কথা হচ্ছে, যে দিন সোনেমার্গ পাহাড় দেখতে গিছলাম সেদিনের।

অনেকগুলো মাইল মোটরে শেষ ক'রে যেখানে থাকা হ'ল, সেখানটা পাহাড়ের গা হ'লেও বিস্তীর্ণ একটা সমতল ক্ষেত্রের মতো। বাস মোটররা এখানে ছুটি নিল, শুনলাম এখান থেকে ঘোড়া নিতে হবে।

আমরা ভেবেছিলাম গাড়িবানরা যেমন এদিক ওদিক তাকানো ফ্যালকামুখো ভ্রমণকারী দেখলেই "শেঠ জী গাড়ী, শেঠ জী গাড়ী" ক'রে ছেঁকে ধরে, ঘোড়াবানরাও বুঝি তেমনই ছেঁকে ধরবে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে উল্টো ব্যাপার।

অপরাপর করিৎকর্ম্মা যাত্রীরা মুহূর্ত্তে কে কোন দিকে ছিটকে ঘোড়াওয়ালা বা ওদের দেশীয় ভাষায় 'গোরেবালা' সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আমাদের নাকের সামনে সদর্পে রওনা হয়ে গেলেন, আর আমরা বেচারীর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আর ঘোড়া মিলবে না। দু-একটা যা ঘোড়া পড়ে রয়েছে সেগুলোকে দেখলে স্বর্গ পাড়ি দেবার বাসনা জন্মের শোধ মিটে যায়।

# গল্প ভালো আবার বলো

এই সবুজ প্রকৃতি আর প্রচুর জলের দেশে স্বর্গীয় শোভাময় উপত্যকায় জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার ঘোড়াগুলো যেন বিধাতার ব্যঙ্গের মতো বিচরণ করছে।

শুনলাম আগের ভাল ঘোড়াগুলো ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সফর সেরে ফিরে আসবে। বললাম, 'তাই হোক। অপেক্ষাই করব, এদের পিঠে চড়া হবে না।'

কাজেই ফেরার অপেক্ষা।

বসে থাকতে থাকতে দুপুরের রোদ বিকেলের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল। ফিরতে সহযাত্রীর ভারী দলটি যে যার বাসে মোটরে চড়ে বসলেন। আমরা এবং আরো জনাকয়েক সেই প্রত্যাগত ক্লান্ত ঘোড়াগুলির ওপর সওয়ার হয়ে রওনা দিলাম। পুত্রের কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো, সে গ্লেশিয়ারের ছবি তুলবে ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমাদের নাকের সামনে দিয়ে সদর্পে রওনা হয়ে গেলেন। [ পৃঃ—১৫৩

# গল্প ভালো আবার বলো

গুলমার্গ, খিলেনমার্গ ইত্যবসরে ঘুরে এসেছি, কিন্তু আজকের পথের মতো এমন কষ্টকর দুর্গম লাগেনি সে পথ। মনে হচ্ছিল এটা যেন একটা পরিত্যক্ত জায়গা, কখনও কেউ আসে না। কিন্তু আসেও তো সবাই দেখলাম।

আমরা তিন জন, আর অপরিচিত যে দলটি সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাঁরা জনা চার-পাঁচ—এই ক'জন চললাম আমরা। কিন্তু তেমন যেন আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বেলা পড়ন্ত হয়ে এসেছে। হিম বাতাসের তীক্ষ্ণ দাঁত অনেক পোশাক-পরিচ্ছদের প্রাচীর ভেদ ক'রেও যেন হাড়ের মধ্যে কামড় দিচ্ছে।

চারিদিক নিঝুম স্তব্ধ।

শুধু ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ আর মাঝে মাঝে তাদের আরোহীদের পড়ে যাওয়ার ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠার শব্দ। আশ্চর্য্য! বারে বারে পড় পড় হয়েও পড়লাম না কেউই। অনেকটা উঁচুতে উঠে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামা হল।

পাহাড়ে উঠে পড়ে অথবা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে, বেশ ভাল লাগল, কিন্তু পুত্ররত্ন বায়না ধরলেন তিনি আরো এগোবেন, নইলে গ্লেশিয়ারের ফটো তোলা হয় না।

বারবার নিষেধ করলাম, সঙ্গের যাত্রীরাও বললেন, আর এগোলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু ছেলে বেপরোয়া, সে এগিয়েই চলেছে। কেন জানিনা খুব ভাল লাগছিল না। আমরা বারবার নিষেধ করতে লাগলাম ওকে, শুধু সেই 'গোড়েবালা' ছোকরা এক মুখ হেসে নিজস্ব ভাষায় বুঝিয়ে দিল ভয়ের কিছু নেই। অনেক ভাল ভাল বাবু আর লাট বেলাট সাহেবরা ছবি নেবার জন্যে আরো অনেক উঁচুতে চড়ে চলে যায়। কিন্তু আমি একেবারে বিদ্রোহ ক'রে বসে পড়লাম। কাজে কাজেই ছেলেও অগ্রগতির পথ ছেড়ে একটি মনের মতো শিলাখণ্ড খুঁজে বেড়াতে লাগল যেখান থেকে সুদূরবর্ত্তী গ্লেশিয়ারকেও ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

# গল্প ভালো আবার বলো

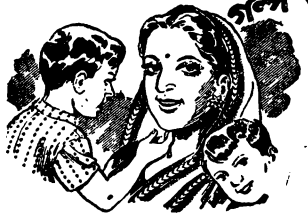

ছেলেটা পাছে পড়ে গিয়ে বিপদ ঘটায় সেই ভয়ে দৃষ্টি একমুখী ক'রেই রেখেছিলাম। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

কারণ দেখলাম, অন্য সহযাত্রীরা ইত্যবসরে স্বর্গ-দর্শন পালা শেষ ক'রে ঘোড়ায় উঠে উল্টোমুখ ধরেছেন। অর্থাৎ এই আসন্ন সন্ধ্যার মুখে মাটি থেকে অনেক হাজার ফুট উঁচুতে একটি প্রাণহীন শব্দ-হীন অদ্ভুত জায়গায় পড়ে রইলাম আমরা তিনটি প্রাণী। রক্ষক বলতে শুধু সেই সদ্য জোয়ান ঘোড়াওলা ছোকরা।

কিন্তু সে কি রক্ষক? স্বামীর পকেটে নোটের গোছা, নিজের গায়েও যা হোক কিছু সোনা, ছেলের হাতে ঘড়ি, আঙুলে আংটি, সার্টে সোনার বোতাম।

ছোকরা একমুখ হেসে বুঝিয়ে দিলো, ভয়ের কিছু নেই [ পৃঃ—১৫৫

# গল্প ভালো আবার বলো

ওই বন্য বর্ব্বরের হাত থেকে এখন কে আমাদের রক্ষা করতে পারে?

ভগবান?

তিনি কি চেঁচালে শুনতে পান?

ছেলের দিকে চাইলাম। অনেকখানি দূরে একটি পাথরের টুকরোর ওপর গুছিয়ে বসে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে তিনি মহোৎসাহে 'রেঞ্জ' ঠিক করেছেন, আর ঠিক তার পিছনে সেই ঘোড়াওলা ছোকরা ওৎপাতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখে তার লোভের দীপ্তি, হাতে পায়ে অসহনীয় ব্যগ্রতা।

হ্যাঁ, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, অথবা তার ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ জামার জেব থেকে টেনে বার করতে পারে একখানা ঝকঝকে ছুরি।

কোথাও কোনো জীবনের সাড়া নেই।

কোথাও একটা পাখী পর্য্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ছে না। মাথার উপর দিকে পর্ব্বত, অরণ্য যেন নিঃশব্দ আতঙ্কে একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছে।

শুধু মাঝে মাঝে মৃত্যুর স্পর্শের মতো একটা হিমশীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীতে যে কোথাও কোন সভ্যতা আছে, কোথাও কোন লোকবসতি আছে, কোথাও কোন জীবন্ত প্রাণী আছে, সে বিশ্বাস যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

আমার ছেলেটা বেপরোয়া নিশ্চিন্ত হয়ে বসে, ঘোড়াওলা ছেলেটাও তার পিছনে হিংস্র শ্বাপদের মতো নিঃশব্দ থাবা এগিয়ে দাঁড়িয়ে। হয়তো বা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আর একটু বা হয়তো বেশী ঝুঁকে পড়েছিল, আমার চোখের সামনে শুধু একরাশ অন্ধকার! চীৎকার করতে গেলাম, গলা দিয়ে কোন স্বর ফুটলো না, ছুটে এগোতে গেলাম, এগোতে পারলাম না। হিমে আর আতঙ্কে সমস্ত শরীর পাথরের মতো হয়ে গেছে। অসহায়ের মতো স্বামীর দিকে তাকালাম, তিনি শুধু ইসারায় আমাকে চেঁচাতে নিষেধ ক'রে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন উদ্বিগ্ন গম্ভীর মুখে।

কিন্তু উনি এগিয়ে গিয়ে কি করবেন?

● একটি বন্যবর্ব্বরতা

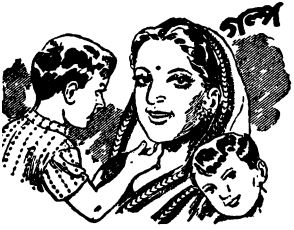

# গল্প ভালো আবার বলো

অস্ত্রহীন শুধু দু'খানা হাতে উনি কি ওকে ঠেকাতে পারবেন? জেবের মধ্যে যার হয়তো ধারালো ছুরি লুকানো আছে? চীৎকার ক'রে ছেলেকে সাবধান ক'রে দেবেন তারও উপায় নেই। হয়তো ওই শিকারলুব্ধ বন্য প্রাণীটা ছুরি বার করতে যেটুকু ইতস্ততঃ করছে, সেই চীৎকারেই সে ইতস্ততঃর বাধাটুকু কাটিয়ে ফেলবে।

আর যদিই বা ছুরির সাহায্য না নেয়, আরো কতো উপায় আছে ওর। ওরা তো এ পথের নিত্যযাত্রী, যদি আমাদের তিনজনকেই কোনো খাদে গড়িয়ে ফেলে দেয়, তাহ'লেও তো ওর অভীষ্ট সিদ্ধি হবে। কাল এসে টাকাকড়িগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সর্ব্বনাশা ভয়ের থেকেই বোধকরি সাহসের জন্ম।

হঠাৎ প্রাণে কেমন সাহস এল।

মনে হ'ল, বেশ এইভাবে সপরিবারে মৃত্যুই যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে, তাই হবে। হোক তাই। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়জনের বিপদ দেখব কেন? পিছন থেকে গিয়ে আমিই বা আগে ওকে আক্রমণ করব না কেন?

জানিনা জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। এই তো অস্ত্র ছড়ানো রয়েছে হাতের কাছে কাছে।

পৃথিবীর যে ভূমিতে আজো প্রস্তরযুগের পরিবেশ স্থির হয়ে আছে, সেখানে সে যুগের অস্ত্রও বেমানান নয়। জীবজগতের প্রথম অনুভূতি বুঝি আতঙ্ক। তাই আতঙ্কগ্রস্ত প্রাণীর আচরণের মধ্যেই তার মূল প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বামী একবার আমার হাতের পাথরটার দিকে কি দৃষ্টিপত করেছিলেন? হয়তো করেছিলেন, হয়তো করেন নি।

হয়তো আমার এই ভয়ঙ্কর হিংস্র মূর্ত্তিকে মনে মনে অসমর্থনও করেন নি। ওঁর কথা জানিনা। নিজের কথাই বলি।

যে মুহূর্ত্তে আমি দেখছিলাম, আততায়ীর ওপর হাতের পাথরটা ছুঁড়ে দেওয়া

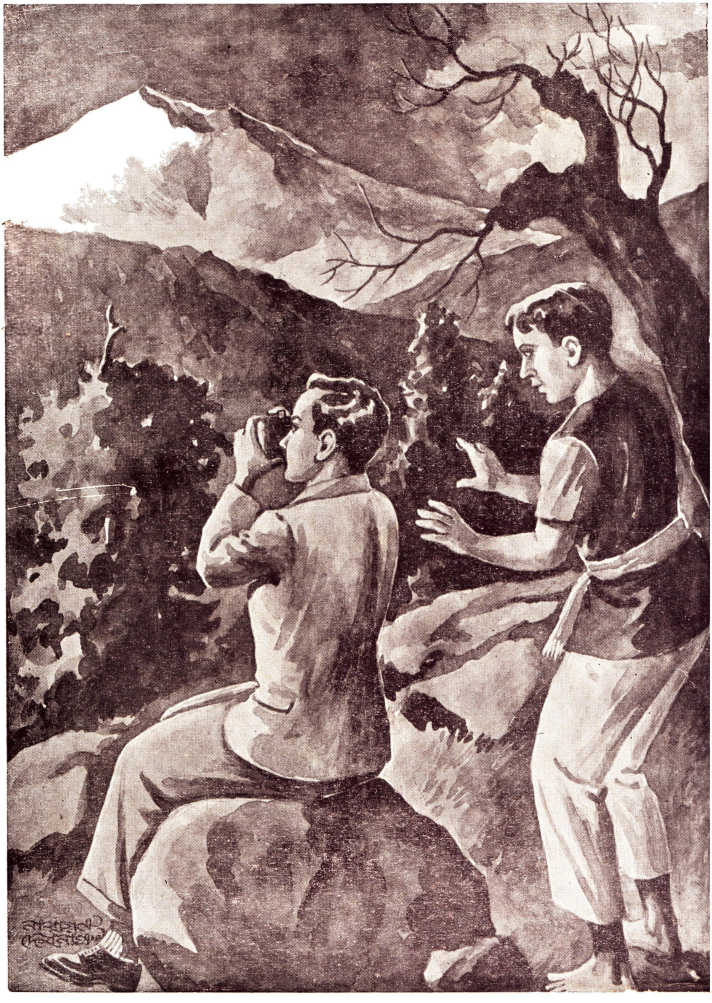

যে কোন মুহূর্ত্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে·····

# গল্প ভালো আবার বলো

চলে কি না, সেই মুহূর্ত্তেই ছোকরা একেবারে সামনে হুমড়ে পড়ল।

সেই মুহূর্ত্তেই—হ্যাঁ সেই মুহূর্ত্তেই—আমিও প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠলাম।

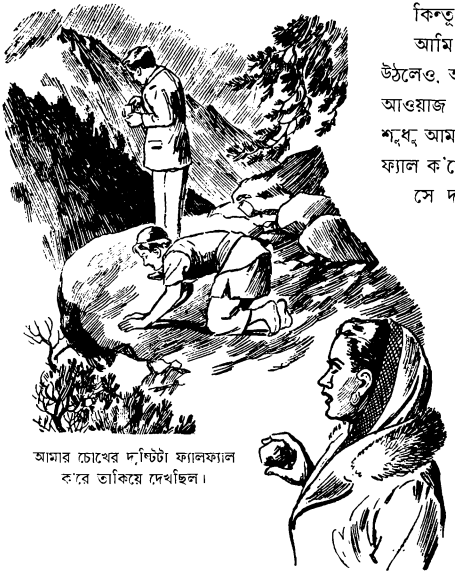

আমার চোখের দৃষ্টিটা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখছিল।

কিন্তু না কোনো শব্দ হয়নি।

আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেও, আমার বিশুষ্ক কণ্ঠনালি আওয়াজ করতে সক্ষম হয়নি। শুধু আমার চোখের দৃষ্টিটা ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখছিল।

সে দৃষ্টি দেখল—পুত্রের ধ্যান-ভঙ্গ হয়েছে, সে দাঁড়িয়ে উঠে ক্যামেরার ডালা বন্ধ করছে। আর সেই হিংস্র বন্য শিকারী যুবক, দু'চোখে যার লোভের দীপ্তি, ঠোঁটের কোণে পরম প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি, সে তার এত-ক্ষণের অভীষ্ট সিদ্ধি করেছে!

হুমড়ি খেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে—সেই 'পরম পদার্থ'টি যার জন্যে এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল ''ছোটো শেঠজী''র ঘাড়ের কাছে!

সে জিনিষটি আর কিছু না, একটুকরো রাংতা!

# গল্প ভালো আবার বলো

ফিল্ম জড়ানো যে রাংতাটুকু এতক্ষণ শেঠজীর কোলের ওপর পড়েছিল আর এখন দাঁড়িয়ে উঠতেই মাটিতে পড়ে গেছে।

মুখে চোখে বন্য খুশির উল্লাস!

রাংতাটুকু বার কতক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে, সন্তর্পণে পকেটে রেখে এবার ও কাছে এসে সবিনয়ে জানাল, এবার ফেরা দরকার, আর দেরী করলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যা হ'লেই নানা বিপদের সম্ভাবনা।

হাতের পাথরখানা আপনিই গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, না স্বামী-পুত্রের অলক্ষ্যে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম, অনেক চেষ্টা ক'রেও সে কথা আর এখন মনে করতে পারি না।

শুধু মনে আছে অপরিসীম একটা লজ্জার গ্লানিতে সমস্ত মনটা এই হিম পাহাড়ের বিষণ্ণ বিকেলের মতোই মলিন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

জিনিষটি আর কিছু নয়, একটুকরো রাংতা! [পৃঃ ১৫৯

সে লজ্জা আজও আছে। হয়তো চিরদিনই থাকবে। হয়তো যখনি কাউকে

সে গুড়ে বালি রে সে গুড়ে বালি !

# গল্প ভালো আবার বলো

শুধু দরিদ্র ব'লে, শুধু অশিক্ষিত ব'লে, শুধু বন্য ব'লেই অকারণ সন্দেহ ক'রে বসব, তখনই নিজের সেই বন্যবর্ব্বরতার লজ্জা একটুখানির জন্যেও মনকে সচেতন ক'রে তুলবে, তুলবে ভারাক্রান্ত ক'রে।

তিন তিনটে ঘোড়া আর তিন তিনটে সওয়ারকে সামনে নিয়ে ছেলেটা যখন সেই দীর্ঘ দুর্গম পথ নিজে হেঁটে পার হয়ে আমাদের সমতল জায়গায় এনে পেঁছে দিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি ওর ঘোড়ার ভাড়া মিটিয়ে দিতে স্বামী ব্যস্ত হয়ে পার্সটা বার করলেন। নোটের তাড়া থেকে দেখে গুণে গুণে হিসেব ক'রে ওর প্রাপ্য পাওনা মিটিয়ে দিতেই, ছেলেটা নিতান্ত অনুনয়ে নিজের প্রাপ্য চুক্তির ওপর সামান্য কিছু বক্‌শিশ প্রার্থনা করল।

আধুলির মতোই চকচকে মুখে দানটুকু গ্রহণ করল ছোকরা।

দাবি নয়, শুধু প্রার্থনা।

প্রার্থনা মিটোতে পার্সের গহ্বর থেকে বেরল একটি চকচকে আধুলি।

নতুন আধুলির মতোই চকচকে মুখে, হাত পেতে সেই করুণার দানটুকু গ্রহণ করল ছোকরা; একতাড়া নোটের দু'ইঞ্চি তফাৎ থেকে।

# বই-বাতিকের সুফল

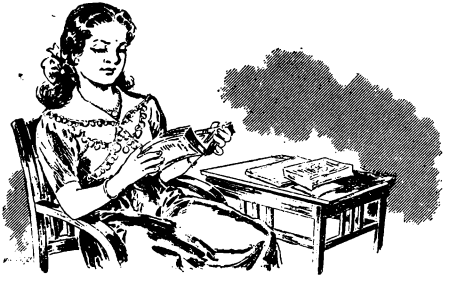

"গল্পের বই আর গল্পের বই! একবার পড়ার বই হাতে দেখি না, এ মেয়ের ভবিষ্যৎ একেবারে কাজল কালি!"

বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিণ্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করে অবাক হয়ে বলে—"কিন্তু পায় কোথায় এতো বই? বই কিনে তো একটি পয়সা বাজে খরচ করা হয় না, অথচ চব্বিশ ঘণ্টাই হাতে বই যোগান আছে। সত্যি, পায় কোথায়?"

কথাটা সত্যি, পায় কোথায়!

গল্পের বই পড়ার নেশায় যারা পাগল, বই না হলে যারা একদণ্ড টিকতে পারে না, বই তারা পায় কোথায়? সেই অনির্ব্বাণ নেশার খোরাক তাদের জোটে কোথা থেকে?

মিণ্টুদের বাড়ীতে না হয় বই কিনে একটি পয়সাও বাজে খরচ করা হয় না, এমন অনেক বাড়ীতেই হয় না, কিন্তু যাদের বাড়ীতে হয়, তারাও জানে বই কিনে কখনো বইখোরের খোরাক মেটে না। লাইব্রেরীতেও কুলোয় না। কাজেই বক-রাক্ষসের মতো সেই দুর্দ্দান্ত খিদে, বকরাক্ষসের পদ্ধতিতেই মেটাতে হয়।

যেখানে যতো চেনা চেনা বাড়ী আছে, আত্মীয়-বন্ধু, পাড়াপড়শী, সহপাঠী-সহ-পাঠিনী—প্রত্যেকের বাড়ী থেকে পালা করে খোরাক জোটাতে হয়। সকলেই জানে এ

# গল্প ভালো আবার বলো

না দিলেই নয়, একটু অনিচ্ছে প্রকাশ করলেই বই-পাগল আত্মীয় বা আত্মীয়াটি জন্মেরশোধ আড়ি দিয়ে বসে থাকবে। শুধু নিজেদের বাড়ীর কেনা বই-পত্তরই নয়, তাদেরও আত্মীয়-পরিচিতের বাড়ীর বই (যা' তারাও চেয়ে এনেছে), লাইব্রেরীর বই, ছেলেমেয়েদের প্রাইজের বই, নতুন কনের উপহার পাওয়া বই—সবই দিতে হবে বই-বাতিককে।

মিণ্টুরও চলছিলো এইভাবে।

বছর তিন-চার বয়েস থেকেই মিণ্টু পাড়ার লোকের বিভীষিকাস্থল!! কারণ সেই বয়েস থেকেই সে, প্রায় মার কোলে চড়ে বেড়াতে যাওয়া থেকেই, লোকের বাড়ীর বইয়ের ভাঁড়ারে খাবোল দিতে শিখেছে।

কিন্তু কিছুদিন থেকে বাজার বড়োই মন্দা চলেছে মিণ্টুর। একই বই তিনবার করে চেয়ে এনে আর তেরোবার করে পড়েও দিন আর কাটছে না। শুনেছি, ভাতের অভাবে লোকে গাছের পাতা খায়, কথাটা যে মিথ্যে নয় তা' মিণ্টুকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। গরমের ছুটির দুপুরের শূন্যতা ভরাতে মিণ্টু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাখানাই আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছে, পড়েছে টাইমটেবল, ষ্ট্রীট্ ডাইরেক্টরী, বাংলা ক্যালেণ্ডার —শব্দকল্পদ্রুম।

তবু ভরিল না চিত্ত!

অতএব ছটফট করতে করতে একবার এ ঘর—একবার ও ঘর করতে করতে দুপুর কাটাচ্ছিলো মিণ্টু। হঠাৎ ও-ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে গেলো। এ কী? এ দৃশ্য তো মিণ্টু জন্মেও দেখেনি। ও রাস্তার উল্টোদিকে যে হলদে রঙের বাড়ীটা আছে, সেই বাড়ীতে নতুন লোক আসছে! এর নাম বাড়ী ওঠা? বাড়ীটা কিনেছে কি ভাড়া নিয়েছে ঈশ্বর জানেন, কিন্তু গাড়ী গাড়ী জিনিস এসে পড়েছে। কতো খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল, কতো চেয়ার চৌকী আলনা, আর তারই মাঝখানে একটা জিনিস মিণ্টুকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে। সেই জিনিসটা ছাড়া চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না মিণ্টু!

# গল্প ভালো আবার বলো

সে জিনিসটি আর কিছু নয়, এক লরী বই। চারটে খালি আলমারী আসছে পিছন পিছন আর একটা লরীতে। আর সামনের লরীতে বড়ো বড়ো ঝুড়িভর্ত্তি শুধু বই!

মিণ্টুর মনে হলো এখুনি জানলা গলিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওর ওপর পড়ে! আহা, মিণ্টুর যদি অদৃশ্য হয়ে যাবার মন্তর জানা থাকতো!

যতোক্ষণ না সেই পর্বতপ্রমাণ বই বাড়ীর মধ্যে ঢোকানো হলো, ততোক্ষণ ঠায় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকলো মিণ্টু। আর বইয়ের ঝুড়িগুলো শেষ হতেই মিণ্টু ফাঁকা ফাঁকা মনে বসে বসে ভাবতে লাগলো কি করে ওই বইগুলি পড়া যায়।

যেমন করে হোক ওদের বাড়ীর কারো সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফ্রকের কোণ আর চুলের রিবনের একটু আভা মার চোখে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে মা চীৎকার করে উঠলেন—"এই মিণ্টু মুখপুড়ি, খাবার না খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিস যে?"

"বেরোচ্ছি না—" বলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারলো মিণ্টু। এইমাত্র জানলা দিয়ে দেখেছে সে হলদে বাড়ী থেকে একটা মেয়ে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরোলো। নিশ্চয় পার্কে যাবে। ওকে একবার ধরতে পারলেই তো হয়ে গেলো! মিটে গেলো সমস্যা। এক মিনিটেই ভাব। ভগবান নিশ্চয়ই আছেন, তা নইলে ওদের বাড়ীতে ঠিক মিণ্টুর বয়সীই একটা মেয়ে থাকে?

মিণ্টু লাল ভাজা ভাজা পরোটা ভালোবাসে বলে মা লাল লাল করে পরোটা ভাজছিলেন, না খেয়ে পালিয়ে যাওয়ায় রেগে গজ্‌গজ্‌ করতে থাকেন—"হতচ্ছাড়া মেয়ে আসুক একবার! যতো বড়ো হচ্ছে ততো ধিঙ্গী হচ্ছে।"

গালফুলো মোটা মেয়েটা হাঁটছিলো থুপথুপিয়ে, ধরতে বেশী দেরী হলো না মিণ্টুর। একেবারে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললো—"তোরাই কাল ঐ হলদে বাড়ীটায় এসেছিস না রে?"

# গল্প ভালো আবার বলো

গালফুলো মেয়েটা আরও গাল ফুলিয়ে বলে—"ফট্ করে 'তুই' বলছিস মানে? আচ্ছা অসভ্য মেয়ে তো?"

মিণ্টু একটু দমে গিয়ে বলে—"বললেই বা ভাই—আমি তো তোমার সঙ্গে ভাব করবো বলেই—"

"না না ভাব করতে হবে না—" মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বলে—"আমরা এ পাড়ায় কারো সঙ্গে ভাব করবো না দিব্যি গেলেছি।"

মিণ্টু অবাক হয়ে বলে—"কেন ভাই?"

"কেন আবার? মেজকাকার হুকুম! ভাব হলেই তো সব্বাই বই চাইবে? মেজকাকার এতো বইয়ের শখ, আর যতো লোকে চেয়ে নিয়ে গিয়ে গিয়ে কিছু রাখে না। ছিঁড়ে দেয়, হারিয়ে দেয়, ওই জন্যেই তো আমরা সে পাড়া ছেড়ে এতো দূরে চলে এসেছি!"

কারো সঙ্গে ভাব করবো না দিব্যি গেলেছি।

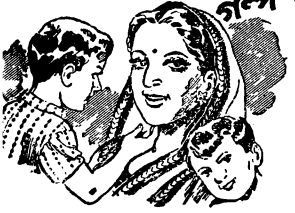

# গল্প ভালো আবার বলো

কথা শুনে তো মিণ্টুর হয়েই গেছে! এতো আশা সব বৃথা? বই দিতে অনেকেই চায় না বটে, অনেক খোসামোদ করে চেয়ে আনতে হয়, কিন্তু বই চাওয়ার ভয়ে কেউ পাড়াছাড়া হয়ে পালায়, এমন কথা কখনো শোনেনি মিণ্টু! সেই লরী বোঝাই বই তাহ'লে মিণ্টুর পড়া হবে না!

ততোক্ষণে এরা পার্কে এসে পড়েছে। মোটা মেয়েটা এইটুকু হাঁটার খাটুনিতেই বেঞ্চে বসে পড়েছে। মিণ্টুও গুটিগুটি পাশে এসে বসে।

"তোমার নাম কি ভাই?"

"ফের? ফের ভাব করতে আসছিস?" মেয়েটা চোখ পাকিয়ে বলে—"বারণ করলাম না!"

"বাঃ, নাম জিজ্ঞেস করলে দোষ কি?" মিণ্টু ফিকে ফিকে হেসে বলে—"আমি তো আর তোমাদের বই চাইতে যাচ্ছি না?"

"যাচ্ছিস না—যেতে কতোক্ষণ?"

মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে বসে। সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করছে!

এদিকে মিণ্টুর যে মরণ বাঁচন সমস্যা। এক লরী বই!

একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মিণ্টু উদাস নিশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে—"তোমার কী মজা!"

মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে বলে—"কেন মজা কিসের?"

"অতো বই পড়তে পাও।"

"ও—তোরও তাহ'লে নিশ্চয়ই ওই খেয়াল আছে? আমি বাবা বইটই ছুঁইও না—" মুখ বাঁকিয়ে বলে মেয়েটা, "লোকে যে ওর মধ্যে কি মজা পায় লোকেই জানে! কেউ ঘাড় গুঁজে বসে বসে বই পড়ছে দেখলেই আমার রাগ ধরে যায়। পড়তে ভালো লাগে না বলেই তো আমি ইস্কুলে ক্লাসে উঠি না।"

বেশ গর্ব্বিত ভাবেই নিজের গুণপনা জাহির করে মেয়েটা।

# গল্প ভালো আবার বলো

মিণ্টু আর উদাস ভাব বজায় রাখতে পারে না, ব্যাকুলভাবে বলে—"তোমাদের বাড়ীর বইগুলো তুমি পড়োনি?"

"মোটেই না! বই দেখলেই আমার গা জ্বালা করে। ও পাড়ার বন্ধুগুলো বই বই করে মরতো দেখে তাদের মারতে ইচ্ছে করতো আমার, বই আবার মানুষে পড়ে।"

মেয়েটি আর যাই হোক স্পষ্টবক্তা যে তাতে আর সন্দেহ নেই।

মিণ্টু আবার কিছুক্ষণ চুপ!

তারপর একটু নড়েচড়ে বলে—"তোর মেজকাকা বুঝি খুব রাগী?"

"না রাগী তো না! খুব ভালো। শুধু কেউ বই চাইলেই ক্ষেপে যায়।"

মিণ্টু চেপে চেপে একটা নিশ্বাস ফেলে।

সবদিক থেকেই আশা ভরসা নির্ম্মূল। কেউ বই চাইলেই যে ব্যক্তি ক্ষেপে যায়, সে যে কি করে ভালো লোক হতে পারে, সে কথা মিণ্টুর বুদ্ধির বাইরে! তবুও এতো সহজে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। চোখ কুঁচকে অবোধের ভান করে বলে—"সত্যি বুঝি? আচ্ছা, কেউ যদি তোদের বাড়ী গিয়ে বইয়ের ঘরে বসে বসে পড়ে?"

মেয়েটা এবার ভয়ানক রকম চোখ পাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়—হাতমুখ নেড়ে বলে—"ও তুই বুঝি এই মতলবে আছিস? সে গুড়ে বালি রে সে গুড়ে বালি! বই বাঁচাবার জন্যেই পাড়া ছেড়ে উঠে এসেছে মেজকাকা, বইয়ের ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গোতে দেবে কাউকে মনে করেছিস্?"

মিণ্টু অপ্রতিভ ভাবে বলে—"আহা আমার কথা তো বলছি না, লোকের কথা বলছি।" বলে আস্তে আস্তে উঠে আসে।

বাড়ী ঢুকতেই মা গরম পরোটা 'পান্তা' হয়ে যাওয়ার কথা তোলেন, কিন্তু মিণ্টুর ওসবে মন নেই। ও শুধু সেই একলরী বইয়ের কথা ভাবছে। আর ভাবছে কী অদ্ভুত আশ্চর্য্য ওই মেয়েটা! অতো বই ওদের আর ও মোটে ছোঁয় না? উঃ!

# গল্প ভালো আবার বলো

মিণ্টু যদি ওদের বাড়ীর মেয়ে হতো! কিংবা মিণ্টুর যদি ওই রকম একটা মেজকাকা থাকতো!

হায়, মেজ সেজ কিছু না।

মিণ্টুর কোনো কাকাই নেই।

ফুলের কাছে যেমন মৌমাছি, গুড়ের কাছাকাছি যেমন মাছি, হলদে বাড়ীর ধারে কাছে তেমনি মিণ্টু। পার্কে যেতে, কিংবা মোড়ের দোকান থেকে খাতা পেন্সিল কি লজেঞ্জুস্ আনতে পথে বেরোলেই মিণ্টু একেবারে হলদে বাড়ীর গা ঘেঁসে ঘেঁসে যাবেই, আর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মেরে দেখবে!

না দেখে উপায় কি! বইয়ের সেই বিরাট দপ্তরটিকে তো বাইরের দিকের এই ঘরটাতেই জায়গা দিয়েছেন 'মোটাগিন্নী'র মেজকাকা। 'মোটাগিন্নী' কে তাই ভাবছো? সে তো সেই মেয়েটা। ইত্যবসরে পাড়ায় ওর এই নতুন নামটিই বাহাল হয়ে গিয়েছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটে আলমারী ঠাসা বাংলা বই!

চকচকে উপন্যাস, বাঁধানো পত্রিকা, ছোটদের বড়োদের সব কিছুই সমান যত্নে সাজিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক! বোধ হয় নতুন পাড়ায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে সাজিয়ে বসেছেন!

ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করে করে দেখেছে মিণ্টু।

রাগী বলে মনে হয় না, কিন্তু ওঁর নিজের ভাইঝিই বলেছে বই চাইলেই ক্ষেপে যান! কোন্ সাহসে তবে মিণ্টু ফট্ করে ঢুকে পড়ে বলবে "উঃ কতো বই আপনাদের, এই ঘরে বসে আমি একখানা পড়বো?"

ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভালো করে চাইতেই যে ভরসা হয় না।

কিন্তু ভগবান সত্যিই আছেন।

অন্ততঃ মিণ্টুর ভগবান মিণ্টুর জন্যে আছেনই।

# গল্প ভালো আবার বলো

হঠাৎ একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দারুণভাবে পরিচয় হয়ে গেলো মিণ্টুর। কারণটা প্রায় বানানো গল্পের মতো। মিণ্টু একদিন পথের মাঝে মেজকাকার প্রাণরক্ষা করলো! কি তোমরা ভাবছো স্রেফ বানিয়ে বলছি? মোটেই না! সত্যি সত্যি তেমনি একটা ঘটনা সংস্থাপন হয়েছিলো সেদিন সকালে।

মিণ্টু গিয়েছে খাতা কিনতে; দেখে, ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেরোচ্ছেন! বুকটা তো ধুক্‌পুক্‌ করে উঠলোই মিণ্টুর!

মনে হলো—উঃ, এখুনি মিণ্টুর কাছ ঘেঁসে চলে যাবেন মেজকাকা, (মনে মনে 'মেজকাকা'ই ডাকতে সুরু করেছে মিণ্টু) অথচ মিণ্টুর সাধ্যি হবে না ডেকে উঠে আলাপ করে নেয়। সারা দুপুর ঘরটা চাবি বন্ধ থাকে, মেজকাকা সন্ধ্যায় এসে ফের খোলেন। আহা, যদি মিণ্টুকে ঘরে বসতে দিয়ে চাবি বন্ধ করে চলে যান মেজকাকা! সারাদিন মিণ্টু শুধু পড়বে আর পড়বে।

মেজকাকা আসার আগেই দোকানের কাছ থেকে একটু এগিয়ে গেলো মিণ্টু যেন কিছুই জানেনা। যেন মেজকাকাকে স্বপ্নেও চেনেনা। যেন বাড়ী ফেরার কোনো তাড়াও ওর নেই এই ভাব। মেজকাকা কিন্তু প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আর দৌড়তে দৌড়তে সেই ফরসা ধবধবে স্যুট্‌ পরা ভদ্রলোকটি সপাটে আছাড় খেলেন ফুটপাথের ওপর!

এরপর কি করে সন্দেহ করতে পারা যায় ভগবান নেই বলে? ফুটপাথের ওপর ওই কলার খোসাটা না থাকলে তো আর মেজকাকা পড়ে মরতেন না? আর না পড়লে, কিছু আর মিণ্টু ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে তোলবার চেষ্টা করতো না!

অবিশ্যি সত্যিই কিছু আর তুলতে হয়নি তাকে, সেই দুর্মণ জ্যান্ত বস্তাটিকে তোলা মিণ্টুর কর্ম্মও নয়, কিন্তু প্রথম রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে তো মিণ্টুর নামটাই রইলো! নইলে কলকাতার রাস্তায় কেউ যদি হঠাৎ পড়েই যায়, সেকি দুর্দণ্ড শান্তিতে পড়ে

# গল্প ভালো আবার বলো

থাকতে পায়? হাতে করে কেউ টেনে তুলুক আর না তুলুক, "এই এই" "গেলো গেলো"..."কি হলো...কি হলো" "জল, পাখা, অ্যাম্বুলেন্স"..."দেখে চলতে হয় মশাই" "যাচ্ছিলো তো পৈত্রিক প্রাণটা"..."ব্যায়রাম আছে নাকি কিছু? মাথা ঘুরুনি, কি হার্ট-ট্রাবলস্?" ইত্যাদি সহস্র কথার ধাক্কাতেই তাকে ঠেলে তুলবে।

মেজ কাকাকেও তুললো।

উঠে বসলেন মেজকাকা। সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টু 'সমবেত জনতার' উদ্দেশে বক্তৃতা দিলো—"ভীড় ছাড়ুন না, ভীড় ছাড়ুন, হাওয়া পেতে দিন, দেখছেন না কী অবস্থা ওঁর! ই—স্! জলে কাদায় ফর্সা সুট্টা একেবারে শেষ করে দিলে সবাই।" তারপর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে সকরুণ স্বরে

ভদ্রলোকটি সপাটে আছাড় খেলেন ফুটপাথের ওপর! [পৃঃ—১৬৯

# গল্প ভালো আবার বলো

বলে—"খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে নাকি মেজ কাকা?"

'মেজকাকা' শুনেই মেজকাকা চমকে ওঠেন! এ আবার কে? জন্মেও তো চোখে দেখেন নি। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট্ লেগে তাঁর কি দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে?

"তুমি কে?"

কোমর ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রশ্ন করেন মেজকাকা।

"আমি কেউ না, আমি মিণ্টু। আপনার খুব লাগেনি তো মেজকাকা?"

"না না লাগেনি এমন কিছু, সকলে মিলে যা করলো!"

মিণ্টু স্নেহময়ী পিসিমার ভঙ্গীতে বলে—"এখন আবার এই ছিষ্টি পোশাক-টোশাক বদলাতে হবে! রাস্তার লোকগুলোর যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! জল দিবি দে, দেখে শুনে দে! চলুন আমি আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসি।"

মেজকাকা চমৎকৃত!

"তুমি আমার বাড়ী জানো নাকি?"

মিণ্টু বড়ো করে ঘাড় হেলিয়ে বলে—"কেন জানবো না? ওই তো হলদে বাড়ীটা। যে বাড়ীতে অনেক—"

মিণ্টু ঢোক গিলে চুপ করে যায়। বইয়ের কথা তুললে আবার পরিণাম কি হয় কে জানে!

মেজকাকা এগোতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টু।

কলার খোসায় আছাড় খাওয়া লোকটা বিনা রক্তপাতে হাত পা মাথা আস্ত রেখে তখুনি দাঁড়িয়ে উঠলো দেখেই রাস্তার বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। মেজকাকা সন্দেহ সন্দেহ স্বরে বলেন—"কি অনেক?"

"ইয়ে—মানে—অনেক খাট আলমারী, চেয়ার-টেয়ার, সেদিনকে লরী করে এলো না? ঝুড়ি ঝুড়ি বই, তা'পর গে—"

# গল্প ভালো আবার বলো

মেজকাকা অন্য প্রসঙ্গে চলে যান—"তা' তুমি হঠাৎ আমাকে 'মেজকাকা' বললে যে?"

"তা' আপনি যখন মুটকী—ই-স্ ঊষার কাকা, তখন আমারও কাকা! ও আমার বন্ধু কিনা।"

"ওঃ তুমি ঊষার বন্ধু? বাড়ী কোথায় তোমার?"

"ওই যে ওই দিকে—" বলে দশদিকের যে কোনো একটা দিক হতে পারে, এইভাবে আঙ্গুল দেখিয়ে মিণ্টু "ওইঃ যা—" বলেই ছুটে যায়।

খাতাটা পড়ে আছে সেই দুর্ঘটনার জায়গায়। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে মিণ্টু। নতুন খাতাটা জলে কাদায় যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।

"এঃ, ছি, ছি, তোমার খাতাটাতেও যে জল ঢেলে দিয়েছে দেখছি! স্কুলে যাচ্ছিলে বুঝি?"

"না, খাতা কিনতে—"

"এ্যাঁ, কিনতে? নতুন খাতা? এ যে ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!"

মিণ্টু পরম লজ্জিত ভাবে বলে—"না না ও কিছু না, শুকিয়ে নেবো।"

মেজকাকা লোককে বই দিতে চান না বলে তাঁর মধ্যে যে বিবেক নেই তা' তো নয়? আর বিবেক থাকলেই তার দংশন আছে!

মেয়েটা মেজকাকার জন্যেই তো এই লোকসানের মুখে পড়লো! তিনি সস্নেহে বলেন—"এসো তুমি—কি যেন নাম বললে? মিণ্টু না? এসো, আমার কাছে অনেক খাতা আছে।"

"য়্যাঁঃ! শুধু শুধু খাতা নেব কেন?" মিণ্টু লজ্জাবতী লতার মতো মাথা নীচু করে বলে—"এটা শুকিয়ে নিলেই হয়ে যাবে।"

মেজকাকা কিন্তু ততোক্ষণে বাড়ী পৌঁছে গেছেন,—সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টুও।

আর এক প্রস্থ পোশাক বদলাতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েন মেজকাকা, আর বলে যান, "দেখো যেন পালিও না।"

# গল্প ভালো আবার বলো

যেন পালাবার জন্যেই ব্যস্ত মিণ্টু!

এই বই বই গন্ধ ঘরে যতোক্ষণ থাকা যায় ততোক্ষণই তো লাভ তার। কাঁচের বাইরে থেকে নামগুলোও তো পড়া যায়?

বেশ মোটাসোটা বাঁধানো একখানি খাতা হাতে করে মেজকাকা ফিরে আসেন নতুন পোশাক বদলে! মিণ্টুর খেয়াল নেই। সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। একী! মিণ্টু যেন আলিবাবা! ওর চোখের সামনে যেন ডাকাত দলের রত্নভাণ্ডার। শুধু একবার "চিচিং ফাঁক" মন্ত্রটি উচ্চারণের ওয়াস্তা!

কিন্তু কি সেই মন্ত্র?

কে উচ্চারণ করবে?

করবে নয়, করলেন!

আর কেউ নয় মেজকাকা। তিনি হাঁ করা মিণ্টুর অবস্থা দেখে একটু হেসে ফেলে বলে উঠলেন—"তুমি বই পড়তে খুব ভালোবাসো বুঝি?"

মিণ্টু চমকে চোখ তুলে তাকালো।

সে চোখে লজ্জা, কুণ্ঠা, বিস্ময়, বিনয়, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা!

মেজকাকা খাতাখানি তার হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও! বই পড়তে খুব ইচ্ছে হলে এখানে এসো—বার করে দেবো। এখানে বসে পড়তে হবে কিন্তু? বাড়ী নিয়ে যেতে পাবে না।"

মিণ্টু 'উচ্ছ্বসিত আনন্দের উত্তাল সমুদ্র' হৃদয়ে চেপে শান্তভাবে বলে—"না না বই বার করবেন কেন? কারোকে যখন দেন না; শুধু শুধু আমার জন্যে—"

মেজকাকা হেসে ফেলে বলেন—"কাউকে দিই না কে বললে?"

"ঊষাই বলেছে! ঠিকই করেছেন আপনি। লোকের তো আর পরের বইয়ে যত্ন থাকে না, ছেঁড়ে ময়লা করে।"

# গল্প ভালো আবার বলো

মেজকাকা উত্তরোত্তর চমৎকৃত। মুখ টিপে হেসে বলেন—"তোমার নিশ্চয় পরের বইয়ে খুব যত্ন আছে?"

"তা' আর বলতে—" মিণ্টু একগাল হেসে বলে —"খবরের কাগজের মলাট না দিয়ে ভালো বইতে হাতই দিই না আমি।"

"আচ্ছা আমি এখন [illegible] আচ্ছি, কাল বরং এসো [illegible]ন?"

মেজকাকা তাড়াতাড়ি চলে যান, মিণ্টুও পথে নামে। একটা চাকর এসে দোর বন্ধ করে দিয়ে যায়!

অতঃপর কাল আসে মিণ্টু।

কাল থেকে কতো কাল তার ঠিক নেই! কাল আসে, পশু আসে, সকালে আসে, সন্ধ্যায় আসে, মার কাছে কানমলা খেয়েও আসে! [illegible] এসে থাকবে কি করে মেজকাকা যে চিচিং ফা[illegible] করে দিয়েছেন!

মার কাছে কানমলা

মিণ্টু চমকে চোখ তুলে তাকালো! । পৃঃ—১৭৩

# গল্প ভালো আবার বলো

খেয়ে কতোই আর যন্ত্রণা? তার চাইতে হাজার গুণ যন্ত্রণা এই বইগুলো—না পড়ে চলে আসা!

মেজকাকা মিণ্টুকে এতো ভালোবাসতে সুরু করেছেন যে ঊষা রেগে মরছে!

আলমারী খুলে বই বার করে দিতে দিতে মেজকাকা বলেন—"তোমার বন্ধুটি, মানে ঊষা, কই তার সঙ্গে তো তোমায় খেলতে দেখি না?"

মিণ্টু অম্লান বদনে বলে—"বন্ধু আবার কোথা? ও আমাকে দেখতেই পারে না!"

"তাই নাকি? তবে যে সেদিন বলেছিলে—"

"বলেছিলাম এমনি! এক বয়সী তো!"

মেজকাকা মৃদু হেসে বলেন—"কিন্তু ও তোমায় দেখতে পারে না কেন?"

"ওই যে আমি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি। ও বলে—"

মেজকাকা হা হা করে হেসে উঠে বলেন—"তাই নাকি? আমি কিন্তু গল্পের বই ভালোবাসা ছেলেমেয়েকে খুব ভালোবাসি,—যদি তারা বই না ছেঁড়ে আর [illegible] নিয়ে গিয়ে না হারিয়ে দেয়! তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, সুন্দর মেয়ে! তোমাকে [illegible] খুব ভালো লাগে!"

"সত্যি!"

অবাক আর ছলছলে চোখে মিণ্টু বলে—"সত্যি বলছেন?"

মেজকাকাও মিণ্টুর ভাবান্তরে অবাক। "সত্যিই তো! তাতে কি? কি হলো? চোখে জল কেন?"

আর কেন!

মিণ্টুর চোখে বড়ো বড়ো ফোঁটা!

"মেজকাকা আমি খুব খারাপ।"

"কী মুস্কিল! কেন কি হলো হঠাৎ?"

# গল্প ভালো আবার বলো

"আপনার সঙ্গে চেনা করে আপনার বইগুলো পড়ে নেবো বলে আমিই সেদিন—"

মেজকাকা উত্তরোত্তর অবাক!

"আরে বাবা চোখ মোছো, চোখ মোছো! কি তুমি সেদিন?"

"রাস্তায় কলার খোসা রেখে দিয়েছিলাম!"

'ফেলে' নয় 'রেখে'!

"কলার খোসা 'রেখে' দিয়েছিলে!!" মেজকাকা স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি!

"হ্যাঁ। রাস্তার ধার থেকে কুড়িয়ে! নইলে কিছুতেই যে আপনার সঙ্গে চেনা হচ্ছিলো না।"

মিন্টু ফুঁপিয়ে ওঠে।

মেজকাকা সেকেণ্ড দুই চোখ গোলগোল করে তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই হো হো করে ছাত ফাটানো হাসিতে ফেটে পড়ার মতো হয়ে বলেন—"বটে! বটে! তাই বুঝি? বাঃ বাঃ! একেই তো বলে বুদ্ধি। গল্পের বই না পড়লে কি আর এমন বুদ্ধি পরিষ্কার হয়?"

**সমাপ্ত**

দেব সাহিত্য কুটীর